অমর একাদশ



শীল্ড নিয়ে তোলা ১৯১১ সালের মোহনবাগান দলের একমাত্র ছবি। (বাম থেকে ডাইনে) ঃ বসে আছেন—জে, রায় (কানু), এস, সরকার (হাবুল), এ, ঘোষ, বি, ভাদুড়ী ও এস, ভাদুড়ী (অধিনায়ক) ; দাঁড়িয়ে আছেন—আর, সেনগুপ্ত, এন, ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জি, এম মুখার্জি, এস, চ্যাটার্জি ও এ. সুকুল (ভুতি)।

মোহনবাগান ১৯১১

পরেশ নন্দী

করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

ইতিহাস সৃষ্টিকারী মোহনবাগান দল



১৯১১ সালে ঐতিহাসিক ফাইন্যালের পূর্বে তোলা ছবি। (বাম থেকে ডাইনে): বসে আছেন: বি. ভাদুড়ী, এস, সরকার, এস, ভাদুড়ী (অধিনায়ক), জে. রায় এবং এ, সুকুল। দাঁড়িয়ে আছেন: এ, ঘোষ, এন, ভট্টাচার্য, আর, সেনগুপ্ত, এইচ, মুখার্জি, এম, মুখার্জ্জি ও এস, চ্যাটার্জি।



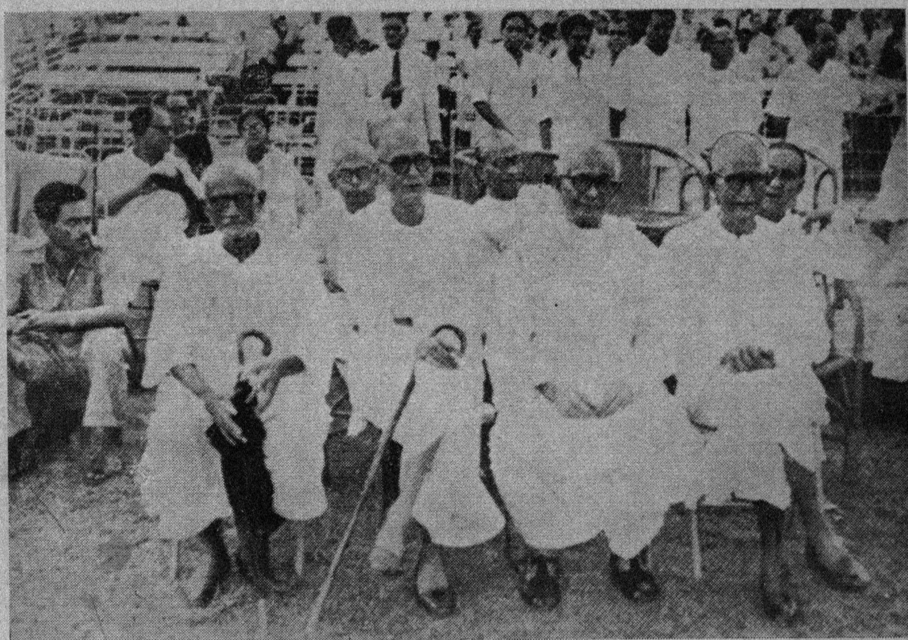
প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ : ১৩৬৬

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
প্রদীপ কুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
চারু খান

জীবন সন্ধ্যায় চার মহারথী



১৯১১ সালের অমর একাদশের মধ্যে ১৯৫৮ সালে জীবিত ছিলেন মাত্র চারজন এবং তাঁরা মোহনবাগান মাঠে এসেছিলেন একটি প্রদর্শনী খেলা দেখতে। (বাম থেকে ডাইনে): হীরালাল মুখার্জি (গোল রক্ষক), কানু রায় (রাইট আউট), রেভা: সুধীর চ্যাটার্জি (লেফ্‌ট ব্যাক) ও হাবুল সরকার (ইনসাইড রাইট)।

উৎসর্গ

আমার

শিউলমা, খেয়ালমা এবং মুকুটকে

বাবুজী

ফাইন্যালে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী



ইষ্ট ইয়র্কস (বাম থেকে ডাইনে) : বসে আছেন—মার্টিন, হেউড, জ্যাক্‌সন (অধিনায়ক) স্কালি ও বার্চ ; দাঁড়িয়ে আছেন : ডিক্‌সন, হাওয়ার্ড, ক্রেসি, ব্লু কাস, নিল ও হুইটনি।

ভূমিকা

মোহনবাগানকে নিয়ে বই লেখার জন্য কোন ভণিতার প্রয়োজন নেই। বইটির প্রয়োজনেই এই ভূমিকা।

মোহনবাগানের জনপ্রিয়তা শুধু অসাধারণ নয়, অতুলনীয়ও বটে। মোহনবাগান সম্বন্ধে ফুটবল প্রেমিকের মনোভাবকে কেবল জনপ্রিয়তা বললে অনেক কিছুই যেন না-বলা থাকে। সামান্য জনপ্রিয়তার আকর্ষণ নয়; ফুটবল রসিকের সঙ্গে মোহনবাগানের নাড়ীর টান, গভীর আত্মীয়তার বন্ধন।

ফুটবল জগতে বহু দলেরই অসামান্য জনপ্রিয়তা আছে। সাফল্যের উত্তাপে এ' জনপ্রিয়তা লালিত ও বর্ধিত হয়। মোহনবাগান প্রেম কিন্তু মোটেই সাফল্য নির্ভর নয়। মোহনবাগানের অগণিত সমর্থকেরা "...সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" এ' দলকে ভালবাসে। এমন নিষ্কাম জন-সমর্থন আর কোন দলের আছে বলে আমার জানা নেই।

এ' জন-সমর্থনের কারণ সম্বন্ধে অনেকে আগেও প্রশ্ন তুলেছেন এবং এখনও অনেকে তোলেন। সাধারণ ভাবে ক্রীড়ারসিকের ধারণা যে ১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ডে ঐতিহাসিক জয়লাভই এমন গভীর দল-প্রীতির প্রধান কারণ। সেই সুদূর অতীতে, ভারতীয় ফুটবলের প্রথম যৌবনে, একটি বাঙ্গালী দলের সর্বপ্রথম শীল্ড জয় নিশ্চয়ই অসামান্য গৌরবের ব্যাপার। সেই শীল্ড অভিযানে উপর্যুপরি তিন-তিনটি সৈনিক দলকে পরাজিত করার কৃতিত্বও নিঃসংশয়ে অপূর্ব।

তবু আবেগ-বর্জিত বিচারে সে জয়লাভকেই মোহনবাগান প্রীতির প্রধান কারণ বলে মেনে নেয়া কঠিন। মনে হয়, "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" মনে হয় এই প্রীতির উৎস লুক্কায়িত আছে আরো গভীরে।

ক্রীড়া-সাংবাদিকের কর্মব্যস্ত জীবনে এ' প্রশ্ন অন্যান্য অনেকের মত আমার মনেও জেগেছিল। তখন কিন্তু উত্তরের জন্য আরো গভীরে প্রবেশের অবসর হয় নি। কিছুদিন পূর্বে সেই ঐতিহাসিক শীল্ড জয়ের মর্মস্থলে প্রবেশের উদ্দেশ্য নিয়ে পুরাতন সংবাদপত্রের পাতাতে নজর দিয়েছিলাম। ইতিহাসের মাপকাঠি হাতে নিয়ে সেই শীল্ড অভিযানের সম-সাময়িক বিবরণের অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

বৃথা হয়নি সে' প্রয়াস। হতবাক হলাম বিস্ময়ে। মৌণ অতীত মুখর হল। দীর্ঘ অনুসন্ধানে অতীতের অন্ধকার থেকে আহরণ হল অনেক অজানা তথ্য। সংবাদপত্র-সমুদ্র মন্থনে বিষ এবং অমৃত দুই-ই পেলাম। উদ্‌ঘাটিত হল বাংলা ও বাঙ্গালী ফুটবলের অতীতের একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। হল অপূর্ব এক উপলব্ধি। তারই ফলশ্রুতি "মোহনবাগান ১৯১১" বইটি।

সামান্য ক্রীড়াক্ষেত্রের বিবরণ পড়ছি বলে মনে হল না। মনে হল এ' যেন এক আধুনিক কুরুক্ষেত্রের বিবরণ। এ' যেন মাত্র দুটি দলের মধ্যে এক অঘোষিত সংগ্রাম। একদিকে সমস্ত সামরিক ও বে-সামরিক ইংরাজ দল, অন্যদিকে একটি মাত্র দল—'বাবু' মোহনবাগান, তুচ্ছ বাঙ্গালী দল। যুযুধান দুই শিবির এবং বিবরণ লিখছেন প্রধানতঃ ইংরাজ লেখকেরা। অবশ্য ভারতীয় লেখকও ছিলেন একজন।

এদের দৃষ্টিভঙ্গী এক হওয়া সম্ভব নয়। তবু বারবার একই কথা শোনা যাচ্ছে দু'জনের মুখে। সেই সুদূর অতীতে ১৯১১ সালে নাকি খেলা দেখতে মাঠে লোক আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে। আসছে তারা শহর থেকে, শহরতলি থেকে এবং দূর গ্রামাঞ্চল থেকে। ত্রিশ...চল্লিশ...ষাট···আশী হাজার পর্যন্ত লোক।

ফুটবল সম্বন্ধে তারা নাকি কিছুই জানে না। জীবনে কখনও তারা ফুটবল খেলা দেখে নি। তবু তারা আসছে। আসছে তারা, কারণ তাদের কাছে এ' খেলা নয়। এক ধরনের মেলা। তারা শুনেছে মাঠে নাকি সাহেবরা হেরে যাচ্ছে বাঙ্গালীর কাছে। তাই নিধিরাম সর্দারেরা এসেছেন বাঙ্গালী দলকে মদত দিতে।

শীল্ড জয়ের সম্ভাব্য উত্তেজনাতে নয়, জনতা সেদিন মোহনবাগান কেন্দ্রিক হয়েছিল সাহেবদের পরাজয়ের বিমল আনন্দ উপভোগের কামনাতে। ব্যর্থ, বঞ্চিত বাঙ্গালীর বুকে তখন পুঞ্জীভূত হয়েছে অনেক ব্যথা, অনেক বেদনা। সেই ব্যথা ও বেদনার পশ্চাদপটে মোহনবাগান জাগিয়ে তুলেছিল সার্থকতার স্বপ্ন। শেষ পর্যন্ত সফল করেছিল জন-সাধারণের মনের একান্ত কামনা। সেদিন মোহনবাগান সামান্য শীল্ড নয়, জিতেছিল অনেক বেশী।

অতীতের বিভিন্ন লেখকের লেখাগুলি মাত্র আমি বর্তমান ফুটবল প্রেমিকের চোখের সামনে তুলে ধরেছি। আলোচনাও অবশ্য করেছি কিছু কিছু। সম-সাময়িক বিবরণের মাধ্যমেই আজকের ফুটবল রসিকেরা সেই শীল্ড

প্রতিযোগিতাতে যে অদ্ভুত বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল সে' সম্বন্ধে সঠিক হদিশ পাবেন। তাতেই তাদের মন ভরে উঠবে।

লেখাগুলি সবই ইংরাজী ভাষাতে। ১৯১১ সালে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না। আমি সেই লেখাগুলির আক্ষরিক অনুবাদ না করে স্বচ্ছন্দ অনুগমন করেছি। কাগজের নাম উল্লেখ করে সঠিক তারিখ দিয়ে আমি তাদের লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছি। সম্পূর্ণ তথ্য-ভিত্তিক বিবরণের সাহায্যেই সেদিনের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা এবং উত্তেজনার এক আলেখ্য রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

১৯১১ সালের ১০ই থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত কুড়ি দিন বাঙ্গালী কি এক তীব্র উত্তেজনার বন্যাতে ভেসে চলেছিল তা' এই বিবরণগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। সেই না-দেখা দিনগুলির উত্তেজনা হয়ত বর্তমান ফুটবল রসিকের মনেও সঞ্চারিত হবে। এ' ভাবেই অতীতের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সঙ্গে পরিচয় হবে বর্তমান যুগের ক্রীড়ারসিকের।

মোহনবাগান ক্লাবের জনপ্রিয় জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ দের সহৃদয়তা ভিন্ন এ' বইটি এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর করা সম্ভব হত না। তিনি বইটি সম্বন্ধে দু' একটি কথা লিখেও আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। আর প্রচুর সাহায্য করেছেন আমার দীর্ঘ দিনের দুই বন্ধু—সর্বশ্রী করুণা (হাবুল) ভট্টাচার্য (মোহন-বাগান ক্লাবের বর্তমান এসিস্টাণ্ট জেনারেল সেক্রেটারী) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম স্পোর্টস অফিসার সৌরেন সেন আই, এ, এস্ (অবসর প্রাপ্ত)।

এ' বই এর সব কয়টি ছবি মোহনবাগান ক্লাবের নিজস্ব সম্পত্তি। সেই ছবিগুলি এবং মোহনবাগান প্লাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে তারা আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জে, সি, গুহও এ' পুস্তক রচনাতে আমাকে নানা প্রকারে সাহায্য করেছেন। তার নিকট আমি অনেক ভাবেই ঋণী ; সে' ঋণ এখন আরো বাড়ল।

পরেশ নন্দী

প্রথম 'প্রিমিয়র' মোহনবাগান দল



১৯০৬-০৭-০৮ সালে উপর্যুপরি তিনবার ট্রেড্‌স কাপ জয় করে মোহনবাগান 'প্রিমিয়র' ভারতীয় দল বলে স্বীকৃতি পেল। এ দলে ছিলেন :

(বাম দিক থেকে ডাইনে) ঃ মাটিতে—জি, ঘোষ, দাস্থ, বি, ভাতুড়ি ও এইচ, মিত্র ; মাঝখানে—এন, ভট্টাচার্য, পি, রায় ও কে, সিংহ ; পেছনে—বি, তুখী, এইচ, মুখার্জি ও এস, চ্যাটার্জি।

সাহেবপাড়া অন্ধকার! শ্যামবাজারের কি বাহার!

শ্যামবাজার সেদিন কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের অংশবিশেষ নয়। কলিকাতাই শ্যামবাজার; শ্যামবাজারই কলিকাতা। সমস্ত কলিকাতাই সেদিন কেন্দ্রীভূত হয়েছে শ্যামবাজারে।

ঘরের লোক, বাইরের লোক, মাঠের লোক আর ঘাটের লোক—সবাই চলেছে শ্যামবাজারে।

কেবল চৌরঙ্গী এবং তৎসংলগ্ন সাহেবপাড়া বাদ দিয়ে সমস্ত কলিকাতাই সেদিন এক অভূতপূর্ব আনন্দ-উচ্ছ্বাসে প্লাবিত।

মানুষ, আর মানুষ—উত্তাল জন-সমুদ্র!

সামনে চলেছে আই, এফ, এ শীল্ড নিয়ে শোভাযাত্রা। পশ্চাতে প্রবাহিত জনতার স্রোত।

লক্ষ কণ্ঠের গুঞ্জনে মিলিত গর্জন উঠেছে, "জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।"

২৯শে জুলাই, ১৯১১ সাল।

কেউ বলছে না, মোহনবাগান আই, এফ, এ শীল্ড জিতেছে। সবাই কেবল বলছে, "জিতেছে।"

সকলেই তারা মনেপ্রাণে জানে যে মোহনবাগান শুধু সামান্য শীল্ড জয় করে নি। জিতেছে মোহনবাগান অনেক কিছু, অনেক বেশী। খেলার পর খেলাতে মোহনবাগান জিতেছে; আর লোকেরা দেখেছে যে সাহেবরা হেরেছে।

একবার নয়, বার বার।

রামায়ণের যুদ্ধের বড় কথা রাবণ বধ নয়, সীতার উদ্ধার। সেদিনও শীল্ড জয় বড় কথা ছিল না। বড় কথা ছিল সাহেবদের হার। বড় ছিল, শীল্ড জয়ের মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় জাতীয় সম্মানের আংশিক পুনরুদ্ধার।

তাই প্রবাহিত হয়েছে আনন্দের মুক্তধারা। সকলেই তাতে অবগাহন করছে মনের আনন্দে। "এসো এসো" বলে কোন আহ্বান নেই। তবু আসছে সকলেই ; কেউ ফিরে যাচ্ছে না। সবার পরশে পবিত্র করা আনন্দের এক স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

কোন আয়োজন নেই বলেই অসামান্য।

বহুদিন আগে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এমনি আনন্দের বন্যাতে ভেসে গিয়েছিল দেশ। প্রেমের ঠাকুর প্রেমের বন্যাতে ভাসিয়েছিলেন সকলকে। সেদিন নাকি নেড়াবেনেরাও কীর্তনে হয়েছিল ; কাস্তে ভেঙ্গে করতাল গড়িয়েছিল। গলাতে সুর নেই, তবু দু' হাত তুলে গেয়েছিল, "হরি বোল, হরি বোল।" তাই তখন অবস্থা হয়েছিল, "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।"

এ' দিনও শ্যামবাজার ভেসে গেছে, কলিকাতা ডুবু ডুবু।

পুণ্য লগ্নে স্নানযাত্রীরা যেমন গঙ্গা অভিমুখে চলেন তেমনি সকলেই চলেছেন শ্যামবাজারের দিকে। এ' শুধু ফুটবল রসিকের ভীড় নয়। নেড়াবেনে, অর্থাৎ ফুটবল সম্বন্ধে কিছুই জানে না এমন লোকই বেশী।

১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই। মেঘ-মেদুর শ্রাবণ অপরাহ্ন।

মাঠে এসেছিল লক্ষ লোক। খেলা শেষ হলে ক্যালকাটা মাঠ থেকে ভীড়ের চাপেই ভীড় সরে এল মোহনবাগান (বর্তমান প্রেসিডেন্সী) মাঠে। শুধু সেই ভীড় নয়। এখন এসেছে এবং আসছে আরো নূতন লোক।

দেখতে দেখতে ময়দান ছাপিয়ে সে' ভীড় দীর্ঘায়িত হল মনুমেণ্ট পর্যন্ত। তারপর, মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে এস্‌প্লানেড পর্যন্ত। কেবল লোক জমছে ; জমেই চলেছে। যারা খেলা দেখতে যায় নি, সন্ধ্যার সেই পথচারীও ভীড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সে' জনতা উত্তাল হল, উদ্দাম হল।

গৃহমুখী কিন্তু হল না তারা। জনতা তেমনি জমেই রইল।

এসেছিল তারা দূর-দূরান্ত থেকে ; শহর থেকে, শহরতলি থেকে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ ট্রেনে চেপে, আর কেউ বা জাহাজে চড়ে। এসেছিল তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে। কিন্তু পথ এখন আর তাদের ভিন্ন নয়।

সবাই এখন চলেছে শ্যামবাজারের দিকে।

শ্যামবাজারে তখনও সাবেকি চাল। পথে গ্যাসের আলো ; তাও অনেক দূরে দূরে। পথ আলোকিত হয় না ; অন্ধকার হয়ত কিছু তরল হয়। গৃহস্থের ঘরে জ্বলে কেরোসিনের বাতি, কিংবা হ্যারিকেন। সম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈঠকখানাতে শোভা পায় ঝাড় লণ্ঠন। শ্যামবাজারের পথে-ঘাটে তখনও অন্ধকারেরই রাজত্ব।

এ' দিন কিন্তু শ্যামবাজার ঝলমলে আলোকে আলোকিত, আলোর বন্যাতে প্লাবিত।

২৯শে জুলাই এর শ্রাবণ অপরাহ্ণে শোভাযাত্রা চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। অপরাহ্ণ শেষে এল সন্ধ্যা ; সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি।

রাত্রি বটে, কিন্তু পরমোৎসব রাত্রি।

নেই রাত্রির অন্ধকার। রোশনাই, কেবল রোশনাই। অন্তরের এবং বাইরের আলোতে উদ্ভাসিত সেই রাত্রি। নাচে গানে, বাজনাতে বাদ্যিতে এবং আলোতে আনন্দে মুখরিত কলিকাতা।

ময়দান থেকে জনস্রোত ওয়েলিংটন স্ট্রীটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল সন্ধ্যাদীপ। বাজল শাঁখ ; শোনা গেল উলুধ্বনি। কুলবধূরা যেন বিজয়ী বীরবৃন্দের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

সাহেবপাড়া কিন্তু নীরব, নিস্তব্ধ—অন্ধকার।

বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু সত্য।

তখন নেটিভপাড়াতে জমাট বাঁধা অন্ধকার থাকলেও চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট ইত্যাদি সাহেবি অঞ্চল কিন্তু বিজলি বাতির আলোতে ঝলমল। সেখানে রাস্তাতে বিজলি, ঘরে বিজলি।

সন্ধ্যাতে চৌরঙ্গীর চেহারাই পাল্টে যায়। আলোকিত রাজপথের পাশে নামী-দামী হোটেলগুলিতে তখন জমে হুরি পরীর মেলা। ডিনার এবং ড্যান্সে তখন সাহেব মেমরা থাকেন আত্মহারা।

এ' দিন কিন্তু হোটেল সব ফাঁকা। পসরা সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু লোক নেই। গান নেই, নাচ নেই; নেই খানাপিনা। কালো অন্ধকারের ঘোমটাতে মুখ ঢাকা দিয়েছে সাহেবি অঞ্চল। ১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই এর এ' সন্ধ্যাতে সাহেবরা যেন শোকচিহ্ন ধারণ করেছেন।

খেলার মাঠে পরাজয়ের গ্লানিতে সাহেবরা আত্মগোপন করেছিলেন এমন নাও হতে পারে। কিন্তু এ'কথা সত্য যে এ'দিন শ্যামবাজারের যেমন বাহার, সাহেবপাড়া তেমনই অন্ধকার।

সাহেবদের কেউ দোষ দিচ্ছে না। খেলার মাঠে হার হয়েছে বলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহেবিয়ানা ঘুচে যায় নি। যতই অন্ধকার হোক, কলিকাতার সাহেব কখনও নিজ হাতে বাতি জ্বালতে পারেন ? পারেন না। মেমসাহেবরাও সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালতে অভ্যস্ত নন। তারা সব তাই অন্ধকারে বসে বেয়ারা, বাবুর্চি এবং মশালচির জন্য অপেক্ষা করছেন।

কিন্তু, কোথায় গেল এরা সব ?

যাবে আর কোথায় ? সকলেই একসঙ্গে ময়দানে গিয়েছিল খেলা দেখতে। মিশে গিয়েছিল খেলার ভীড়ে। ভেবেছিল খেলার পর ফিরে আসবে নিজ নিজ কাজে। রোজই যায়, আজও গিয়েছে। কিন্তু, অঘটন ঘটিয়ে মোহনবাগান যে তাদের মনেও আগুন ধরিয়ে দেবে তা' কে জানত ? দল বেঁধে খেলা দেখতে গিয়েছিল। খেলার পর এখন দল বেঁধেই চলেছে এক সঙ্গে নাচন-কোঁদন।

তারা এখন সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাত তুলে চীৎকার করছে শ্যামবাজারের পথে পথে। কেবা জ্বালাবে বাতি, কেবা দিবে খাবার ? কাজেই সাহেবদের টেবিলে এ' সন্ধ্যাতে বড়া পেগ, ছোটা পেগ নেই; নেই খানাপিনা।

বাধ্য হয়েই সাহেব মেম মুখ গোমড়া করে বসে আছেন অন্ধকারে। পরাজয়ের গ্লানি না হলেও এ' অন্ধকারের সঙ্গে মাঠের খেলার কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল। তাই ইচ্ছাকৃত না হলেও সাহেবপাড়াতে অনিচ্ছাকৃত নিষ্প্রদীপ। দেখলে হঠাৎ সন্দেহ হতে পারে যে সাহেবরা অশৌচ পালন করছেন।

* * *

এ' দেবভোগ্য দৃশ্য নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তখন বয়স আমার তিন বছর মাত্র। কেউ কোলে নিয়ে এ' গল্প শুনিয়েছিলেন কিনা জানি না। সে' সম্ভাবনা নিতান্তই সামান্য, কারণ ক্রীড়া-রসিক পরিবারে আমার জন্ম নয়। তা' ছাড়া ছিলাম তখন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) একটি ছোট শহরে। সেখানে খেলা নিয়ে খুব মাতামাতি ছিল না।

কর্মজীবনের সূচনাতে কিন্তু আমি হলাম ক্রীড়া-সাংবাদিক। নেশা থেকে খেলা হল পেশা। তখন ক্রীড়াজগতের রাজপথে এবং অলিতে গলিতে পরিক্রমা শুরু করেছি। প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে বিংশ শতাব্দীর ত্রিংশের দশকের মোহনবাগানের সঙ্গে। তখন মোহনবাগানের পূর্বতন দীপ্তি না থাকলেও দাপটের কোন অভাব নেই। তখনও কলিকাতার ফুটবল বলতে মোহনবাগান এবং মোহনবাগানই কলিকাতার ফুটবল।

সে' সময়ে বহুবার, বহুভাবে শুনেছি ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের কথা। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেও সে' আনন্দ প্লাবনের বিবরণ শুনেছি। কিন্তু, কারো কাছে শুনি নি সাহেবপাড়া অন্ধকারের এই অপরূপ কাহিনী। আশ্চর্য!

এই মনমাতান, প্রাণজুড়ান চিত্রের কথা উল্লেখ করেন নি কেউ।

সেই ঐতিহাসিক ফাইন্যাল খেলা দেখেছিলেন এমন দু'জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলাম কর্মজীবনের প্রথম

দিকে। একজন ৺ভূপেন ব্যানার্জি—ক্রিকেট খেলতেন টাউন ক্লাবে। আর একজন ৺প্রবোধ বসু (কেবো-দা)। তিনি গ্রীয়ার ক্লাবে হকি খেলতেন। হকির সেই স্বর্ণযুগেও কেবো-দা একজন বিশেষ কৃতী খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

এদের সঙ্গে দেখা হত রোজ, খোসগল্প হত। দু'জনের কাছেই সেদিনের অনেক খুটিনাটি কথা শুনেছি। গড়পাড়ের ডানপিটে ছেলে কেবো-দা ছিলেন মোহনবাগানের শীল্ডবিজয়ী দলের খেলোয়াড় ৺শ্রীশ (হাবুল) সরকারের বিশেষ স্নেহভাজন। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও হাবুল বাবু কেবো-দাকে বন্ধু মনে করতেন।

কেবো-দাকে সেদিন হাবুল বাবুই নাকি খেলা দেখিয়েছিলেন। খেলার পরও কেবো-দা সন্ধ্যা এবং রাত কাটিয়েছিলেন ৺শৈলেন বসুর বাড়ীতে। তিনি শ্যামবাজারের বাহারের কথা আমাকে অনেক ভাবে শুনিয়েছিলেন। ৺ভূপেন-দাও বলেছিলেন অনেক কথা। কিন্তু, আশ্চর্য এই যে তাঁরা কেউ জনসাধারণের মধ্যে এই অভূতপূর্ব আনন্দ প্লাবনের কথা তেমন করে উল্লেখ করেন নি। বড় জোর বলেছেন, "প্রকাণ্ড মিছিল হয়েছিল।" সাহেবপাড়া অন্ধকারের কথা কেউ বলেন নি।

কেউ বলেন নি ; তবু সাহেবপাড়া অন্ধকারের কথা সত্য। কোন কোন সংবাদপত্র এ' নিয়ে ইঙ্গ-সমাজের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেছিলেন। ইংলিশম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ' নিয়ে কাঁদুনি গেয়েছিলেন। এ' নাকে কান্নার কথা পরে বলব।

তবে কেন কেউ এ' কথা উল্লেখ করেন নি ?

হয়ত, দেখলেই দেখা হয় না। সব জিনিষ সকলের চোখেও পড়ে না। এত বড় ঘটনা সামগ্রিক ভাবে দেখা নিতান্ত সহজ নয়। তার উপর, অধিকাংশ বাঙ্গালীই সে' দিন ছিল এ' আনন্দের অংশীদার। তারা সকলেই মোহনবাগানকে নিয়েই মত্ত। তাদের চোখ

শ্যামবাজারের উপর। তাই তাদের কথাতে মিছিলের ব্যাপারই প্রাধান্য পেয়েছিল।

শীল্ড নিয়ে তখন জনসাধারণ চলেছে এগিয়ে। ময়দান তারা পেছনে ফেলে এসেছে। ময়দান সংলগ্ন সাহেবপাড়া সম্বন্ধে তারা একেবারেই উদাসীন। সেখানে আলো কি অন্ধকার, এ' নিয়ে বাঙ্গালী ক্রীড়া-রসিকের কোন মাথাব্যথা নেই। তাই আনন্দের আলেখ্যই সেদিন তাদের চোখে পড়েছিল। তারা দেখেন নি সাহেবপাড়া অন্ধকারের সেই অপরূপ রূপ।

পূর্ণিমার রাতে অমাবস্যার কথা কেই বা ভাবে ?

সেই আনন্দের অনুভূতিই এখনও ফুলের বুকে গন্ধের মত জড়িয়ে আছে সকলের মনে। সেদিন থেকে সেই আনন্দ জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। সেদিন থেকে জনসাধারণের মনে মন্দিরে বিগ্রহের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে মোহনবাগানের একটি ভাব-মূর্তি। সেদিন থেকে মোহনবাগান ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে জাতির জীবনে।

সেদিন মোহনবাগান সামান্য ফুটবলের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে যে ভাব-লোকে উন্নীত করেছিল তা' আর কখনই কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। সেই অনুভূতিই এখনও ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে সকলের মনে। আত্ম-বিস্মৃত জাতি আমরা। তাই এ' সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন নই।

সচেতন নই বটে। কিন্তু অবচেতন মনে লুকিয়ে আছে সেদিনের স্মৃতি। এ' কারণেই জনসাধারণ বর্তমানেও এমন মোহনবাগান কেন্দ্রিক।

পরে অহরহ নিজের চোখেই দেখেছি মোহনবাগানকে ঘিরে সকলের কি গভীর দরদ! দেখেছি মোহনবাগান সম্বন্ধে তারা কেমন স্পর্শ-কাতর। যত দেখেছি ততই অবাক হয়েছি। কোথা থেকে

ফুটবল দরদীরা পেল এমন নিষ্কাম প্রেম ? "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"—শ্রীকৃষ্ণের এ' উপদেশ অর্জুনের হৃদয় কতখানি স্পর্শ করেছিল জানি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি মোহনবাগান প্রেম মোটেই সাফল্য-নির্ভর নয়।

কিন্তু কেমন করে এমনটি সম্ভব হল তার কোন সদুত্তর কারো কাছে পাই নি। প্রশ্ন করেছি, কি ছিল ১৯১১ সালের সেই জয় লাভে ? বর্তমানের মন নিয়ে অতীতের সেই দিনটির সঠিক মূল্যায়ন তখনও সম্ভব হয় নি। উত্তর পেয়েছি অনেক, কিন্তু সমাধান পাই নি।

হতে পারে, সেই ছিল একটি ভারতীয় দলের সর্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড জয়। বিশেষ গৌরবের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনে একদিন ত প্রথম আসবেই। কয়েকটি সৈনিক দলকে উপর্যুপরি পরাজিত করার কৃতিত্বও নিঃসংশয়ে অসামান্য। তাই বলে পরবর্তী কালে বহুদিন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অভাবেও ম্লান হবে না সেই স্মৃতি ? তাই সংশয়ী মনে সন্দেহ হয়েছে যে বর্তমান মোহনবাগান প্রীতিতে—সামান্য হলেও—আতিশয্যের খাদ আছে।

অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বর্তমানকে বিচার করলে এমনি ভুল হয়। অতীতের সঙ্গে সামান্যতম পরিচয় থাকলে মোহনবাগান প্রীতির উৎস অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজনই হত না।

অতীতকে উদ্‌ঘাটন করে আজ উপলব্ধি করেছি যে বর্তমান যুগের মোহনবাগান প্রীতিতে এতটুকু আতিশয্য নেই। শুধু আজের উচ্ছ্বাসের মধ্যে সেদিনের প্রতিধ্বনি শোনার মত কান চাই। বোঝা চাই, আজ মোহনবাগানকে ভালবেসে সকলেই ভক্তি জানাচ্ছে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছে অতীতের সেই দিনটিকে।

অতীতকে আঁকড়ে থাকা অবশ্য সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু অতীতের মর্মস্থলে পৌছুবার প্রয়াস কখনই নিরর্থক নয়। মোহনবাগানের গৌরবময় অতীতের আলোচনাতে ব্রতী হবার ইচ্ছা

সাংবাদিক জীবনে থাকলেও তখন পর্যাপ্ত অবসর ছিল না। এখন আমার যাবার বেলা; দিন কাটে ত সময় কাটে না। প্রচুর সময় এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাই আরম্ভ করলাম সেই অতীতের অনুসন্ধান। সমুদ্র মন্থনে যদি অমৃত পাই সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করব, মাত্র এ' আশা অবলম্বন করে।

সাংবাদিকের দৃষ্টিতে মনে হল যে অতীত একেবারে হারিয়ে যায়নি। অতীত নিশ্চয়ই আত্মগোপন করে আছে পুরানো সংবাদপত্রের পাতাতে। খুঁজলেই পাওয়া যাবে অতীতের সন্ধান। চোখ দিলাম সেখানে। ভাগ্যিস দিয়েছিলাম।

আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে! অরূপ রতনের সন্ধান পেলাম।

শোনা কথা ও কাহিনীকে এক পাশে ঠেলে রেখে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে, ইতিহাসের মাপকাঠি হাতে নিয়ে যখন পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দেখতে দেখতে অতীতের সেই দিনটির মর্মস্থলে গিয়ে পৌছুলাম তখন আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হলাম। অবাক বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হলাম।

সংবাদপত্রের বিবরণ সকল সময়েই সম্পূর্ণ তথ্য ভিত্তিক। একেবারেই নীরস গদ্য। প্রকৃত মূল্যও তার সে' জন্য। সেখানে কল্পনা বা বানিয়ে বলার কোন স্থান নেই। কখনও হয়ত একটু বাড়িয়ে বলা হতে পারে।

কিন্তু ১৯১১ সালে মোহনবাগানের কথা বাড়িয়ে বলবে এমন সংবাদপত্র কোথায়? ইংলিশম্যান, ষ্টেট্‌সম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ ইত্যাদির নিকট ভারতীয় দল মাত্রই অপাংক্তেয়। খর্ব করতে পারলে তাদের নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ব করবে না ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্র সমূহ। তা' তারা করেও নি।

সূচনাতে তাই সামান্য 'বাবু' দল; সমাপ্তিতে অবশ্য মোহনবাগান।

এদের বিবরণেও কিন্তু বিস্ময়ের কোন অভাব নেই। তাদের প্রাথমিক

অবহেলা কেটে গেল প্রথম দুটি খেলার পরই। তৃতীয় খেলাতেই লাগল ধাক্কা। চোখ উঠল কপালে; কলম হল বেসামাল।

পড়লাম তাদের লেখাগুলি। একবার দু' বার নয়, বার বার। ছত্রে ছত্রে পড়লাম; ছত্রের মাঝে চোখ রেখে পড়লাম। এ'ত সামান্য এক শীল্ড প্রতিযোগিতার সাধারণ বিবরণ নয়। এ' যে জনসাধারণের আনন্দের এবং উত্তেজনার এক অপরূপ আলেখ্য।

যারা লিখেছিলেন তারা খেলার কথাই বলেছেন। কিন্তু সে' লেখার অন্তরালে উঁকি দিচ্ছে তৎকালীন সমাজের এক বিচিত্র চিত্র। এমনটি কল্পনাও করি নি। একি অজন্তা ইলোরার বিস্ময় লুকিয়ে আছে শীর্ণ, জীর্ণ ও বিবর্ণ সংবাদপত্রের পাতাতে।

জাগরণ হল এক নূতন স্বর্গে।

পয়ষট্টি বছর পূর্বের সেই শীল্ড খেলাগুলিতে লোক সমাগম হচ্ছে চল্লিশ, পঞ্চাশ, আশী হাজার পর্যন্ত। অভাবনীয় এবং অকল্পনীয়! কতটুকু তখন কলিকাতার আয়তন? বাড়ছে বটে মহানগরী, কিন্তু কারো মনে তখনও বৃহত্তর কলিকাতার কোন ধারণাই নেই। লোক সংখ্যাই বা কত? তখনও কলিকাতাতে বর্তমানের মত জন-বিস্ফোরণ ঘটে নি। তখনও ফুটবল এমন জনপ্রিয় নয়। খেলে গোরারা এবং সাহেবরা, আর বাঙ্গালী যুব সম্প্রদায়ের এক অংশ। তবু মাঠে আসছে এত লোক।

বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু কথা মিথ্যাও নয়। সমসাময়িক সব সংবাদপত্রেরই ঐ একই বক্তব্য। অকল্পনীয় জন-সমাগমে তারাও বিস্মিত এবং বিমূঢ়। আমরাও আজ তাই।

১৯১১ সালের বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে তন্ন তন্ন করে পড়েছি খেলাগুলির এবং তার আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিকের বিবরণ। পড়েছি প্রত্যক্ষদর্শীর আলোচনা, পড়েছি সাংবাদিকের সমালোচনা। সকলেই এমন বিপুল জন-সমাবেশ দেখে দিশাহারা। ভেবে পাচ্ছেন না,

কেন এই উন্মাদনা ? কি আকর্ষণে এত লোক ময়দানে এসেছে এবং আসছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে ?

দিশাহারা হবারই কথা। ফুটবল খেলা তখনও জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নি। সাহেবদের খেলা, গোরাদের খেলা—তখনও যুব সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ফুটবল আকর্ষণ সীমাবদ্ধ। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র নেই। নেই বেতারের মাধ্যমে খেলার ধারা বিবরণী। তবু, মোহনবাগানের তৃতীয় খেলা থেকেই মাঠে লেগেছে ভীড়।

সে কি ভীড় !

সে ভীড় খেলার মাঠে আগে আর কখনও দেখা যায় নি। পঞ্চাশ···ষাট···আশী হাজার লোক। শহরের লোক, শহরতলির লোক এবং দূর গ্রামাঞ্চলের লোক। কেউ জানে না কোথা থেকে আসে এত লোক। কেউ জানে না কেন তারা আসে। অধিকাংশই তারা ফুটবল সম্বন্ধে অজ্ঞ। ফুটবল কি তাই অনেকে জানে না।

বানিয়ে বলা নয়, বাড়িয়ে বলাও নয়।

সমস্তই বলা হচ্ছে সমসাময়িক সংবাদপত্রের জবানিতে। শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের দ্বিতীয় খেলা ছিল রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে। সেদিনই ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (১৫ ৭.১১) লিখেছিলেন, "দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও মাঠে এসেছিল অনেক লোক।" কিন্তু তৃতীয় খেলা থেকেই ভীড়ের আয়তন এবং জনতার আচরণ দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

রাইফেল ব্রিগেড দলের বিরুদ্ধে খেলাটির বিবরণ দিতে গিয়ে অমৃতবাজার (২১.৭.১১) মন্তব্য করেছিলেন, "এ' সন্ধ্যার জনতা ফুটবল ইতিহাসে অনন্যপূর্ব। মাঠে কম করেও পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এসেছিল। আসতে আরম্ভ করেছিল তারা বেলা দুটো থেকেই। তারপর ডালহৌসি মাঠে কেবল মানুষের মাথা, আর মানুষের মাথা।"

নেটিভ জনতা ইংরাজ মালিকানায় সংবাদপত্রের চক্ষুপীড়ার কারণ মাত্র। তাই ইংলিশম্যান (২০. ৭. ১১) কেবল "প্রচণ্ড ভীড়" বলেই পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। স্টেট্‌সম্যান (২০. ৭. ১১) কিন্তু বলেছিলেন, "কলিকাতার ফুটবলের পক্ষেও এ' দিনের খেলার পূর্বের ও পরের দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব। বিকাল চারটা থেকেই ভারতীয় যুবকেরা মাঠে আসতে আরম্ভ করেছিল। বিশ ত্রিশ মাইল দূর থেকেও এসেছিল বহু লোক। সাড়ে পাঁচটার আগেই মাঠে আর তিল ধারণের স্থান নেই।"

উপসংহারে এই কাগজ লিখেছিলেন, "জন-সমুদ্র—গ্যালারি উপছে পড়ছে। ১৭।১৮ পংক্তি গভীর করে লোক দাঁড়িয়েছে মাঠের চারদিকে। দূরে, বহু দূরে, বাক্স ও টেবিলের উপর যে কত লোক দাঁড়িয়েছিল তার সীমা সংখ্যা নেই। মুখে তাদের স্পষ্ট উত্তেজনা। মনে একটি মাত্র আশা – মোহনবাগানের জয়।"

সেদিন এ' বিপুল জন-সমাগম ছিল গভীর এক প্রহেলিকা। জন-সাধারণের মধ্যে কিন্তু তাদের আসার কারণ সম্বন্ধে কোন গোপনতা ছিল না। তারা সবাইকে তাদের আসার কারণ বলেছিল। সেদিন তাদের কথাতে কেউ তেমন কান দেয় নি। আজ এতদিন পর তাদের কথা আমাদের নিকট বিশেষ অর্থবহ।

তারা শুনেছে—ভগবান জানেন, তারা কেমন করে শুনেছে—বাঙ্গালী নাকি জিতছে সাহেবদের বিরুদ্ধে। তাই এ' অবিশ্বাস্য কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দর্শক হতে তারা আসছে দলে দলে। সৈনিক দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান মাঠে খেলছে। হাজার হাজার লোক দেখছে, বাঙ্গালী লড়ছে সাহেবদের বিরুদ্ধে। লড়ছে না শুধু; বাঙ্গালী জিতেও চলেছে। নিধিরাম সর্দার সব—তাদের ঢাল নেই, তরোয়াল নেই তবু তারা মনেপ্রাণে এ' সংগ্রামে সামিল হয়েছে। মদত দিতে এসেছে তারা বাঙ্গালীকে—মোহনবাগানকে।

এ' জনতা সামান্য ফুটবলের আকর্ষণে আসে নি। তারা এসেছিল ব্যর্থ বাঙ্গালীর সার্থক প্রয়াসের সাক্ষী হতে। সেদিন সেই সার্থক প্রয়াসের নায়ক ছিল মোহনবাগান। তাদের আসার কারণ সেদিন প্রহেলিকা হলেও আজ 'তা' দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

মাঠের খেলা সেদিন তাদের নিকট সামান্য খেলামাত্র ছিল না। তাদের চোখে এ' ছিল এক ধরনের মেলা ; কুম্ভমেলার মত। তাদের মনে ছিল একটি মাত্র কামনা—সাহেবদের পরাজয়, বাঙ্গালীর তথা মোহনবাগানের জয়। তাদের কাছে এ' তিনে মিলে ছিল এক।

তাই সেদিন মোহনবাগান এমন প্রাণের আনন্দ, আত্মার আত্মীয়।

সেদিন জনতার এ' স্বপ্ন সার্থক করেছিল মোহনবাগান। সামান্য শীল্ড শুধু নয় ; জিতেছিল মোহনবাগান অনেক বেশী। তাই সেদিন কলিকাতা মুখরিত হয়েছিল একটিমাত্র মন্ত্রে, "জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।" সেদিন মোহনবাগান শীল্ড জয় করেছিল, কিন্তু শ্রেয়তর জয় ছিল শীল্ড জয়ের মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় জাতীয় সম্মানের উদ্ধার। বহু পরাজয়ের পর সেই ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম সার্থক প্রয়াস।

সেদিন জনসাধারণ এ' কারণেই উদ্দাম ও উত্তাল হয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল আনন্দ প্লাবনে। সাহেবরা অন্ধকারে মুখ ঢাকা দিয়েছিলেন। তাই সাহেবপাড়া অন্ধকার হয়েছিল ; শ্যামবাজারের বাহার খুলেছিল।

সেই অপূর্ব জন-সমাগমই আজ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তাদের উপস্থিতি স্পষ্টই প্রমাণ করছে যে ২৯শে জুলাই এর আনন্দ প্লাবনের প্রস্তুতি বহু দিন ধরেই চলেছিল বঞ্চিত বাঙ্গালীর মনের সঙ্গোপনে।

খেলাটি ছিল উপলক্ষ মাত্র ; জয়লাভ নিমিত্ত মাত্র। জন-

সাধারণের এ' বিস্ফোরণ একপথে না একপথে আসতই। এ' বিস্ফোরণ মারাত্মকও হতে পারত। যেমন হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহে; যেমন হয়েছিল পরে ১৯৪০ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলনে।

সুখের কথা, মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে সেদিন হয়েছিল এক অসামান্য আনন্দের প্লাবন। শ্যামবাজার ভেসে গিয়েছিল, কলিকাতা ডুবুডুবু হয়েছিল। অর্জুনের তীর নিক্ষেপে ভোগবতী যেমন পাতাল থেকে উৎসারিত হয়ে শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল তেমনি অন্তরের গোপনতম স্থল থেকে বিনা আয়াসে নির্গত হয়ে সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস করেছিল জনতার তৃপ্তি-বিধান। সেই সন্ধ্যার জনস্রোত ছিল সমুদ্রের জলস্ফীতির ন্যায় দুর্বার ও স্বভাব উত্তাল। ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ট্রাম বাস বন্ধ করে, পথচারীকে পথে আটকে বুক চিতিয়ে চলে যাওয়া সংগঠিত মিছিল নয়।

অনেক দিনের কথা বটে। তবু সেই তীব্র অনুভূতি বর্তমান ফুটবল রসিকের মনেও প্রবাহিত হচ্ছে ধমনীতে রক্তের মত। মোহনবাগান নামের যাদুই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সেদিনের সেই আনন্দে বাঙ্গালীর আজ সহজাত উত্তরাধিকার।

সেই অমূল্য উত্তরাধিকার সূত্রেই তারা মোহনবাগানকে নিয়ে এমন গর্বিত।

* * *

১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই।

দিনপঞ্জীর একটি দিন মাত্র নয়। এটি একটি বিশেষ দিন—লোকে যাকে বলে স্বর্ণাক্ষরে লেখা দিন। এমন দিন 'ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি'।

ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিন এই ২৯শে জুলাই। লাল কালিতে লেখা দিন। বাঙ্গালীর মনে মঙ্গল দীপের স্থির দীপ্তি নিয়ে প্রতিভাত একটি দিন।

নানা প্রকার পরিস্থিতিতে এ’ দিনটি বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে এসেছিল বাঙ্গালীর জীবনে। আজও সেই স্মৃতি তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার ও বাঙ্গালীর জীবনে ১৯১১ সালে অনেক জটিলতা। নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের অবসান ঘটেছে বটে। কিন্তু রাজপুরুষের কূটনীতির খেলাতে বাঙ্গালীর বুকে ততদিনে জমে উঠেছে অনেক নূতন বঞ্চনা, অনেক নূতন বেদনা।

সমাজ জীবনের মর্মস্থলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্য অপমান এবং অবহেলারও কোন অভাব ছিল না। ১৯০৫ সালে প্রশাসনের অজুহাতে হল বঙ্গ-ভঙ্গ। প্রতিবাদ হল সারা বাংলা জুড়ে। বৃটিশেরা তাতে কর্ণপাতও করলেন না। সদম্ভ উক্তি করলেন লর্ড কার্জন, বঙ্গ-ভঙ্গ নাকি স্যাটল্‌ড ফ্যাক্ট (Settled fact)।

গর্জে উঠলেন স্যারেণ্ডার নট (স্যার সুরেন্দ্রনাথ)। স্যাটল্‌ড ফ্যাক্টকে আনস্যাটল্‌ড করতে গড়ে তুললেন অগ্নিগর্ভ আন্দোলন। ১৯১১ সালের মাঝামাঝি শোনা যাচ্ছে বঙ্গ-ভঙ্গ এবার রদ হবে। তবে ঘোষণা হবে দিল্লীর দরবারে।

ততদিনে বাঙ্গালীর বুক জুড়ে বসেছে ক্ষুদিরাম। যে বালক ১৯০৮ সালে “বিদায় দে মা, ঘুরে আসি” বলে অমর হয়েছিল ফাঁসিকাঠে। অল্প পরেই হল আলিপুর বোমার মামলা। হল আরো কয়েকজন বাঙ্গালীর ফাঁসি ও দ্বীপান্তর। মহৎ প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

ক্ষুব্ধ বাঙ্গালী, ক্ষোভ প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

এ’ ভাবেই এল ১৯১১ সালের জুলাই মাস।

সম্রাটের ভারত সফরের সূচী ঘোষিত হয়েছে। দিল্লীর দরবারের তারিখও ঠিক হয়েছে। বাঙ্গালীর বুকের রক্তক্ষয়ী ক্ষতে প্রলেপ দেবার উদ্দেশ্যে জোর প্রচার চলছে দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণা হবে।

তখনও বাঙ্গালী জানে না দিল্লীর দরবারের অন্তরালে তার

জন্য কি নূতন বঞ্চনা লুক্কায়িত আছে। রাজধানী স্থানান্তরিত হবে কলিকাতা থেকে দিল্লী। বাঙ্গালী বোধ হয় সহজাত রাজনৈতিক প্রবণতার সাহায্যে অনুমান করেছিল এই ষড়যন্ত্র। তাই ১৯১১ সালের জুলাই মাসে বাংলার জনসাধারণের মনে ধূমায়িত অসন্তোষ।

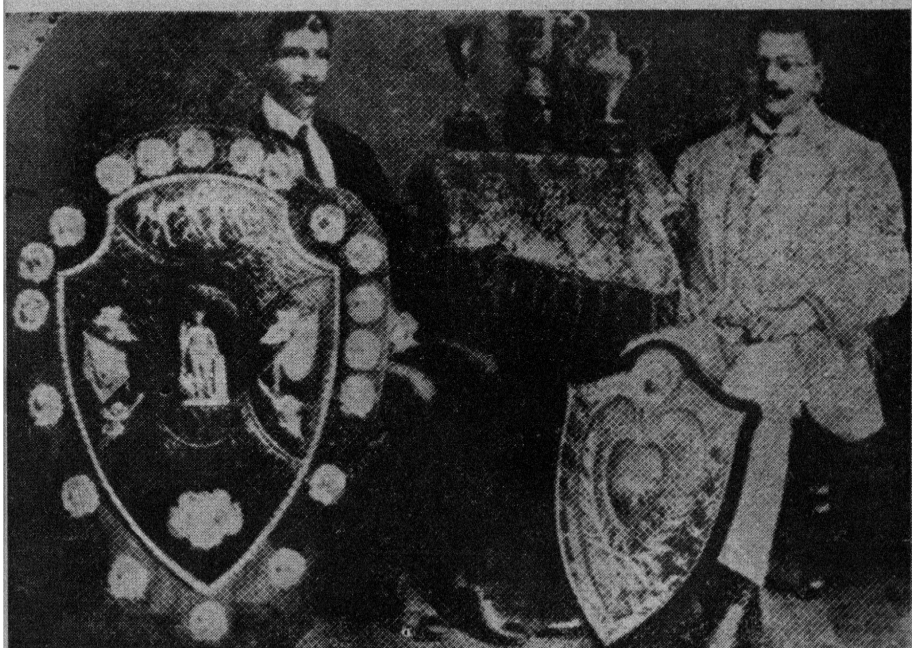
ধান ভানতে শিবের গীত নয়।

বাৎসরিক এক শীল্ড প্রতিযোগিতা কেমন করে জন-মানসে হঠাৎ জাতীয় সম্মানের প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, এ' তারই ইতিহাস-সম্মত বিচার ও বিশ্লেষণ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার পশ্চাদপটেই ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল কুরুক্ষেত্র। "সাহেব পাড়া অন্ধকার, শ্যামবাজারের কি বাহার" কেন হয়েছিল তার উপরও এ' বিশ্লেষণ আলোকপাত করবে। সেদিন সামান্য শীল্ড জয় ছাড়াও মোহনবাগান অসামান্য কি জিতেছিল তা' বুঝতে হলে আজ জন-জীবনের এ' চিত্রের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে হবে।

উপরের পটভূমিতেই আরম্ভ হয়েছিল ১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতা। উনিশ বছর ধরেই চলে আসছে এ' প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক বারই শীল্ড জিতেছে সামরিক বা বে-সামরিক ইংরাজ দল। শীল্ড যেন ইংরাজ দলেরই সম্পত্তি। এবারেও শীল্ডের মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকবে; কোন ব্যতিক্রম হবে না। অন্তঃত ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির তাই ধারণা।

শীল্ড প্রতিযোগিতা শুরু হবার এক সপ্তাহ পূর্বে ইংলিশম্যান (৪.৭.১১) যোগদানকারী বিভিন্ন দলের শক্তির আপেক্ষিক বিচার করে মন্তব্য করলেন, "আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সূচনা হবে আগামী ১০ই জুলাই এবং এ'বারের প্রতিযোগিতা খুবই সফল হবে।...রয়েল স্কট দলেরই শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী...স্থানীয় দলগুলিকে শীল্ড কলিকাতাতে রাখতে খুবই বেগ পেতে হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের মনে হচ্ছে যে আই, এফ, এ শীল্ড এ' বার বাইরেই যাবে।"

দু'জনে মুখোমুখি



বামে, শিবদাস ভাদুড়ী, ১৯১১ সালের মোহনবাগান দলের অধিনায়ক এবং
ডাইনে, ক্লাবের তদানীন্তন সেক্রেটারী শৈলেন বসু।

নয়নের মঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

মোহনবাগানের ১৯১১ সালের আই· এফ· এ শীল্ড বিজয়ী দলের

চারজন খেলোয়াড়



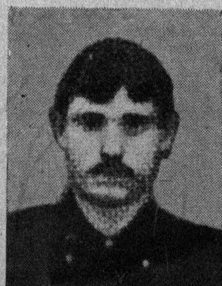
এস, ভাদুড়ী—লেফ্‌ট আউট



আর, সেনগুপ্ত—সেণ্টার হাফ



এন, ভট্টাচার্য—লেফ্‌ট হাফ



হীরালাল মুখার্জি—গোল রক্ষক

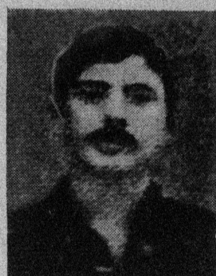
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

মোহনবাগানের ১৯১১ সালের আই. এফ. এ শীল্ড বিজয়ী দলের

আরো চারজন খেলোয়াড়



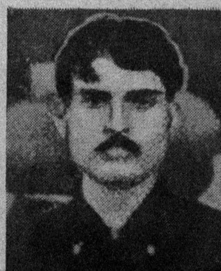
এম, মুখার্জি—রাইট হাফ



ভুতি স্থকুল—রাইট ব্যাক



এস, চ্যাটার্জি—লেফ্‌ট ব্যাক



জে, রায় (কানু)—রাইট আউট

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

মোহনবাগানের ১৯১১ সালের আই. এফ. এ শীল্ড বিজয়ী দলের

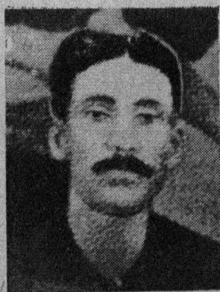
অন্য তিনজন খেলোয়াড়



এস, সরকার (হাবুল)—রাইট ইন



অভিলাষ ঘোষ—সেণ্টার ফরোয়ার্ড



বি, ভাদুড়ী—লেফট ইন

হাতী ঘোড়া গেল তল, ছাগল বলে কত জল ?

ক্যালকাটা, ডালহৌসি ইত্যাদি দিকপাল দলকেই ইংলিশম্যান গণনার মধ্যে আনলেন না। শীল্ড যে কলিকাতাতেই থাকবে এবং মোহনবাগানের ঘরে উঠবে, এমন কথা তারা ভাববেন কি করে ?

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজেরও দৃঢ় ধারণা ছিল যে এ' বারের প্রতিযোগিতাতেও বিজয়ী হবে একটি সৈনিক দল। তবু স্থানীয় দলকে একটু মদত না দিলে ভাল দেখায় না। তাই "লেভেলার" এ' কাগজে (৮. ৭. ১১) লিখলেন, "অনেকেরই হয়ত আমার কথা ভাল লাগবে না (এ' কটাক্ষ ডালহৌসি দলকে লক্ষ্য করে), তবু আমাকে বলতেই হবে যে স্থানীয় দলগুলির মধ্যে শীল্ড জয়ের জন্য ক্যালকাটা দলকে সমর্থন করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

বিচক্ষণ সমালোচক সব—মোহনবাগানের কথা স্বপ্নেও তাদের মনে আসে নি।

আসবেই বা কেন ?

মাত্র দু' বছর ধরে মোহনবাগান এ' প্রতিযোগিতাতে যোগ দিচ্ছে। ১৯০৯ সালে প্রথম বার। তখন ওয়াই, এম, সি, এ দলকে প্রথম খেলাতে ৪-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় খেলাতে পঙ্ককুণ্ডের ন্যায় মাঠে গর্ডন দলের নিকট মোহনবাগান হেরেছিল ৩-০ গোলে।

দ্বিতীয় বার ১৯১০ সালে। তখন প্রথম খেলাতে সেণ্ট জেভিয়ার্স দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় খেলাতে মুখোমুখি হল রাইফেল বিগ্রেড দলের। সেদিনও বৃষ্টিতে মাঠ হল নরম এবং জলসিক্ত ; বল হল পিচ্ছিল। রাইফেল ব্রিগেড বিজয়ী হল ১-০ গোলে।

কাজেই এবারেও মোহনবাগান কখন হারবে সেই ওয়াদা মাত্র।

এ' বছর শীল্ড প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছিল ১০ই জুলাই। প্রথম দিনই খেলা ছিল মোহনবাগানের ; প্রতিপক্ষ ছিল সেই পুরাতন সেণ্ট জেভিয়ার্স দল। আগের বছর মোহনবাগান তাদের সহজেই

পরাজিত করেছিল। কাজেই মোহনবাগানকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু মনের আশা প্রকাশ করতে দোষ কি? ক্ষতি কি একটু হুল ফোটালে?

তাই উদ্বোধনী খেলার পর্যালোচনা করে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (১০. ৭. ১১) মুরুব্বিয়ানা ফলিয়ে লিখলেন, "সেন্ট জেভিয়ার্স বনাম মোহনবাগান খেলাটি ক্ষিপ্র ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। ভারতীয় দলটিরই জয়লাভের সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু এ' জয়লাভ নিতান্ত সহজসাধ্য হবে না, কারণ সেন্ট জেভিয়ার্স দল যখন তখন চমক লাগাতে পারে।"

শেষে দিলেন একটু খোঁচা। লিখলেন, "তার দলের ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য আমরা মিঃ এস, এন, বসুকে প্রশংসা করছি। কিন্তু তার দলের খেলোয়াড়েরা মাঠে বড়ই হাকডাক করে।"

প্রথম খেলার তিন দিন পর ইংলিশম্যান শীল্ড খেলার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে আলোচনা করলেন। ইংলিশম্যানের চোখে মোহনবাগান তখনও "বাবু" দল ছাড়া আর কিছুই নয়। সে' সময়ের ইঙ্গ-সমাজের পরিভাষাতে "বাবু" কথাটিতে থাকত প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এবং কিছু পিঠ চাপড়ান। লিখলেন ইংলিশম্যান (১৩. ৭. ১১) "যেমন আশা করা গিয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স দলের বিরুদ্ধে "বাবু"রা বিজয়ী হয়েছে। পরবর্তী খেলাতে তারা রেঞ্জার্স দলকে হয়ত কিছু বেগ দেবে।"

'বাবু' দল রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে এমন কথা আগ বাড়িয়ে বলা ইংলিশম্যানের ঐতিহ্য বিরুদ্ধ। তাই এ' সংবাদপত্র বললেন, "ফলাফল কি হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আমাদের ধারণা এ' দু' দলের মধ্যে এক গোলের বেশী ব্যবধান হবে না।" অর্থাৎ, মোহনবাগান এক গোলে হারলেও হারতে পারে।

ক্যালকাটা দলকে মদত দিলেন ইংলিশম্যান। লিখলেন ইংলিশ-ম্যান (১৩. ৭. ১১), "ডালহৌসি এবং আর, জি, এ দলের বিরুদ্ধে

বিজয়ী হলে (ক্যালকাটা জিতবে না এমন কথা ইংলিশম্যান বলেন কেমন করে ?) সেমি-ফ্যাইন্যাল খেলা হবে ক্যালকাটা ও রয়েল স্কট দলের মধ্যে। এ' দুই দলের সংঘাতে দেখা যাবে শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলার মত খেলা। এ' খেলাটিতেই শীল্ডবিজয়ী নির্ধারিত হবে।"

মোহনবাগান বনাম রেঞ্জার্স দলের খেলাটি এক গোলের ব্যবধানেই মীমাংসিত হয়েছিল। কিন্তু ক্যালকাটা এবং রয়েল স্কট সম্বন্ধে ইংলিশম্যানের ভবিষ্যৎবাণী যে ভ্রান্ত হয়েছিল সে' কথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বাবু' মোহনবাগানের অসামান্য দলগত শক্তির সঠিক পরিমাপ তখনও এ' সংবাদপত্রের বুদ্ধির বাইরে ছিল। শিবদাসের অপূর্ব ক্রীড়া প্রতিভার কথাও এ' কাগজ তেমন বিবেচনা করে নি। দলগত সংহতি এবং শিবদাসের ব্যক্তিগত প্রতিভার সোনা-সোহাগার মিশ্রণে মোহনবাগান যে অঘটন ঘটাবে, এমন চিন্তা ইংলিশম্যান দুঃস্বপ্নেও করতে পারেন নি। বাঙ্গালী ক্রীড়া-রসিকেরাও তখন পর্যন্ত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে নি।

তারা তখনও বসে আছে আশা নিরাশার মোহনাতে।

আশা কুহকিনী বটে, কিন্তু সে' কুহক সৃষ্টির জন্য, সামান্য হলেও, কিছু অবলম্বন প্রয়োজন। নিরাশার অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোন হেতু নেই। প্রথম দুটি খেলার পর মোহনবাগান এখনও টিকে আছে। কিন্তু আশা করবে তারা কোন জোরে ?

উনিশ বছরের আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতাতে মোহনবাগান প্রথম ভারতীয় দল নয়। এ' দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মোহনবাগানের পূর্বসূরী হিসাবে শোভাবাজার, টাউন এ,সি, হেয়ার স্পোর্টিং এবং চুঁচুড়া স্পোর্টিং ভারতের এ' সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতাতে যোগ দিয়েছে। তারা ত' কখনও এমন করে গঙ্গার জলে আগুন ধরিয়ে দেয় নি!

মোহনবাগান অঘটন ঘটাতে পারে এমন বিশ্বাস জনসাধারণের মনে এল কি করে ?

এ' প্রশ্নের জবাব পেতে হলে এখন একবার বাংলার ফুটবলের কৈশোরের সায়াহ্ন এবং যৌবনের উষালগ্নের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। ১৯১১ সালে শীল্ড জয় করে মোহনবাগান অবশ্য উর্বশীর ন্যায় "বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি" প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পূর্বেও মোহনবাগান এবং অন্য কয়েকটি বাঙ্গালী দল মাণিক মুকুতা নিয়ে শৈশবের খেলা করেছিল।

আগে বলেছি, মাত্র দু' বছর আগে—১৯০৯ সালে—মোহনবাগান প্রথম খেলেছিল শীল্ডে। কিন্তু এ' প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে—আরো ষোল বছর আগে। সেই ষোলটি বৎসর কি বাঙ্গালী ফুটবলের পক্ষে একেবারেই বন্ধ্যা ছিল ? সেই ষোল বছর কি বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা কেবল শীল্ডের খেলা দেখেই দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছিল ? নিজেরা কখনও কোন অংশ গ্রহণ করে নি এ' প্রতিযোগিতাতে ?

না, তা নয়। ১৮৯৩ সালেও বাঙ্গালী শীল্ড প্রতিযোগিতার অলস দর্শক মাত্র ছিল না।

আই, এফ, এ শীল্ডের উদ্বোধনী বৎসরেও তাতে খেলেছিল একটি বাঙ্গালী দল। সেই অনন্যপূর্ব সম্মানের অধিকারী বাঙ্গালী দলের নাম শোভাবাজার।

ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে। ভারতীয় ফুটবলের সেই আদি এবং অন্ধকার যুগেও শোভাবাজার জ্বালিয়ে তুলেছিল এক আশ্চর্য আলো। করেছিল এক অসাধ্য সাধন। সেদিনই বাঙ্গালী ফুটবলের জয়যাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপ হয়েছিল।

১৯১১ সালে আই, এফ, এ শীল্ড জয়ের পথে মোহনবাগান পর পর তিনটি সৈনিক দলকে হারিয়ে এক অপার বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তবু

১৯১১ সালে বাঙ্গালী ফুটবল হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে কিছু পথ এগিয়ে এসেছে। তখন তারা এ' খেলাতে ও খেলাতে মাঝে মাঝে সাহেব দলকে হারিয়ে দিচ্ছে।

১৮৯৩ সালে কিন্তু অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রূপ। এক বছর আগে পর্যন্ত ফুটবল খেলাতে সাহেবরা ছিল অজেয়। সব সময়েই তারা বিজয়ী, বাঙ্গালী বিজিত। ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙ্গালী তখন সম্পূর্ণ বিফল। ঠিক সেই সময়েই অসম্ভবকে সম্ভব করল শোভাবাজার। বিজয়ী হল তারা এক সৈনিক দলের বিরুদ্ধে।

১৮৯২ সালের কথা। শোভাবাজার তখন আট বছরের বালক; জন্ম তার ১৮৮৪ সালে। কিন্তু তখনই চতুর্থ বার যোগ দিয়েছিল ট্রেড্‌স কাপ প্রতিযোগিতাতে। সেবার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এক সৈনিক দল। সে'খেলাতে বিজয়ী হল শোভাবাজার। সেই প্রথম—সর্ব প্রথম—ফুটবল খেলাতে একটি সাহেব দলের হার হল একটি বাঙ্গালী দলের হাতে।

পূর্ব দিগন্তে সেই প্রথম ফুটবল সূর্যোদয়।

শোভাবাজারের সেই দলে ছিলেন ঃ

চৌধুরী, মতিলাল, বি, সর্বাধিকারী, এম, দাশ, কালী মিত্র, এ, পাল, ইউ, ব্যানার্জি এবং বি, দাশ।

মাত্র আট জন; আর তিন জনের নাম হারিয়ে গেছে।

সেই জয়লাভের সূত্রেই শোভাবাজার আই, এফ, এ শীল্ডের প্রথম বছরের প্রতিযোগিতাতে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। খেলা ছিল ৫ম রয়েল আর্টিলারি দলের বিরুদ্ধে। শোভাবাজার সে' খেলাতে হেরেছিল ৩-০ গোলে।

আই, এফ, এ শীল্ডের প্রথম বৎসরের প্রথম বাঙ্গালী দল। এখন সম্পূর্ণ ই বিস্মৃত ইতিহাস। তবু নূতন ইতিহাস সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে একবার দৃষ্টিপাত হল অতীত ইতিহাসের দিকে। সন্ধান

পাওয়া গেল এক হারিয়ে যাওয়া দিগন্তের। পরিচয় হল বাঙ্গালীর ফুটবল গৌরবের প্রাচীনতম অধ্যায়ের সঙ্গে।

কালক্রমে মোহনবাগান হল সেই গৌরবের উত্তরাধিকারী। দীর্ঘ উনিশ বছর পর মোহনবাগান এখন এসে দাঁড়িয়েছে মহত্তর গৌরবের উন্মুক্ত দ্বারপথে।

তবু শীল্ড জয়ের পূর্বেই মোহনবাগানকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতাই কি তার একমাত্র কারণ? জনসাধারণ ভুল করতে পারে; কিন্তু অবলম্বন ভিন্ন তারা আশা করে না। ১৯১১ সালের মোহনবাগান ইতিপূর্বেই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল বলেই জনসাধারণ আরো বৃহত্তর সম্মানের আশাতে উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

মোহনবাগানের জন্ম ১৮৮৯ সালে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। প্রথম ফুটবল খেলে তারা প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে, মোহনবাগান ভিলার ছোট্ট মাঠে। এ' ভাবেই শৈশবে ধুলোকাদা মেখে এ-মাঠ ও-মাঠ করে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই কৈশোর অতিক্রম করে মোহনবাগান হয়ে উঠল প্রাণোচ্ছল যুবক।

১৯০০ সালে ৺শৈলেন বসু হলেন মোহনবাগানের সেক্রেটারী। তারই সুদক্ষ পরিচালনাতে ১৯০৪ সালে মোহনবাগানের জয়যাত্রার সূচনা হল কুচবিহার কাপ জয়ের মাধ্যমে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাতে মোহনবাগানের সেই সর্বপ্রথম জয়লাভ। সেই প্রথম লাগল মোহনবাগানের তরণীর অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।

প্রথম সাফল্যের ছোঁয়াতে পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠল মোহনবাগান। ১৯০৫ সালে জিতল কুচবিহার কাপ এবং গ্লাডষ্টোন কাপ। তারপর জুনিয়র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মোহনবাগান হল দুর্বার। তখন থেকে খেলতে নামলেই জনতা তাদের সামিল হয়। ততদিনে খেলার মাঠে তারা সমর্থনযোগ্য একটি দল পেয়েছে। তখন "টলমল, টলমল পদ ভরে, বীর দল চলে সমরে।"

মোহনবাগান খেলে—আর জিতে।

১৯০৬-০৭-০৮ সালে উপর্যুপরি তিন তিন বার ট্রেড্‌স কাপ বিজয়ী হল মোহনবাগান। ১৯০৭ সালে কুচবিহার কাপও জিতেছিল। আর ১৯০৮ সালে দেখা গেল বসন্তের সর্ব-সমর্পণ। ঘরে এল ট্রেড্‌স কাপ, কুচবিহার কাপ এবং গ্লাডষ্টোন কাপ।

তখন থেকেই মোহনবাগান জন-মানসে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল। এমনটি আর নেই। সাহেবরাও 'প্রিমিয়ার' ভারতীয় দল বলে স্বীকৃতি দিলেন। দিলেন, অর্থাৎ দিতে বাধ্য হলেন।

এখানে ১৯০৫ সালের একটি অম্ল-মধুর কাহিনীর উল্লেখ করছি।

সে'বার এক তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ফাইন্যালে ক্যালকাটা দলকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে ডালহৌসি হয়েছিল আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী। তারপর এল চুঁচুড়াতে গ্লাডষ্টোন কাপের খেলা। বাঘ শিকারের উত্তেজনার পর পাখী শিকারের অলস আনন্দ। সে' প্রতিযোগিতাতে ডালহৌসি দল সহজেই ফাইন্যালে উঠল।

'বাবু' মোহনবাগানের পক্ষে গ্লাডষ্টোন কাপের খেলাও জীবন-মরণ সংগ্রাম। তারাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পৌঁছুল শেষ পর্যায়ে। এখন ফাইন্যাল খেলতে হবে ক্যালকাটা বিজয়ী ডালহৌসি দলের সঙ্গে।

ডালহৌসি দলের ঠোঁটে হাসি, মুখে বিদ্রূপ।

শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে ডালহৌসি ও মোহনবাগান দল একই সঙ্গে চলেছে। চুপচাপ বসে আছে মোহনবাগান দলের এগার জন বিষন্ন খেলোয়াড়। হাসি আর গল্পে মেতে উঠেছে ডালহৌসি দল।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখে মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা। গাড়ীতে ডালহৌসি দলের মাত্র সাত জন খেলোয়াড়। একটু ভরসা পেল; ভাবল অন্য চার জন হয়ত তেমন নামী খেলোয়াড় হবে না। সাহস

করে একজন জিজ্ঞাসাই করল, "আপনাদের বাকী চারজন খেলোয়াড় কোথায় ?"

হাসিতে ফেটে পড়ল ডালহৌসি দল। এমন হাসির কথা যেন ইতিপূর্বে তারা কখনও শোনেনি।

ডালহৌসি দলের অন্য চার জন খেলোয়াড় হাওড়া থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সে' কথা গোপন করে মুখ বেঁকিয়ে বললেন দলের সেণ্টার হাফ প্রাইক, "খেলব ত মোহনবাগানের সঙ্গে; সাত জনই যথেষ্ট।"

বলেই নূতন করে হাসির লহর তুললেন প্রাইক।

হাসিখানি কিন্তু মিলিয়ে গেল চোখের জলে শেষে। শিশু কৃষ্ণের হাতে বধ হল পূতনা রাক্ষসী।

খেলা শুরু হতে না হতেই ডালহৌসির অবস্থা হল ভয়ঙ্কর টাইফুনের মুখে অসহায় ডিঙ্গি নৌকার মত। কোথা দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে তা' বুঝবার আগেই ডোঙ্গা দত্তের কাছ থেকে চমৎকার বল পেয়ে বিজয়দাস করলেন দুটি অনবদ্য গোল। তারপর মারের উপর মার—ডালহৌসি আর কিছুতেই টাল সামলাতে পারল না। হারল ডালহৌসি ১-৬ গোলে।

চুঁচুড়া থেকে ফেরার পথে আর একসঙ্গে নয়। এবার ডালহৌসি দল উঠল অন্য কামরাতে।

জনসাধারণ নূতন করে মোহনবাগানের শক্তির প্রমাণ পেল।

ইতিমধ্যে আই, এফ, এ শীল্ড খেলাতে যোগদানের জন্য মোহন-বাগানের নিকট কয়েক বারই আহ্বান এল। মোহনবাগান কিন্তু কোন সময়েই হঠকারী নয়। চাণক্যের "দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং", অর্থাৎ Look before you leap নীতিতে মোহনবাগান চিরকাল বিশ্বাসী। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন।

মোহনবাগান যে সে' সময়ে বৃহত্তর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নূতন

সম্মান অর্জনে বিমুখ ছিল তা' নয়। জুনিয়র প্রতিযোগিতা সমূহে এমন অসামান্য সাফল্যে ততদিনে মোহনবাগানের আত্ম-প্রত্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। শক্তির পরীক্ষাতে বহু বার তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবু মোহনবাগান জানে শক্তি তাদের এখনও তেমন সুসংবদ্ধ নয়। তাই শীল্ডে খেলার জন্য আমন্ত্রণ এলেও মোহনবাগান তখন সাড়া দেয় নি।

ঠিকই করেছিল মোহনবাগান। ১৯০৮ সালেও দেখতে পাচ্ছি শীল্ড বিজয়ী দলের অনেকেই তখনও মোহনবাগানে নেই। অধিনায়ক শিবদাস নেই, নেই কানু রায়, নেই হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, রাজেন সেনগুপ্ত, মনোমোহন মুখার্জি এবং সুকুল। কাজেই পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয়ের তখনও অনেক বাকী।

পরের বছর দলে এলেন শিবদাস ও সুকুল। তখনও পরিপূর্ণ শক্তিশালী দল নয়। দলের খেলোয়াড়দের অবস্থান পরিবর্তন করে করে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। তবু শিবদাস একাই এক শ'। তাই ১৯০৯ সালে মোহনবাগান প্রথম আই, এফ, এ শীল্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। কিন্তু তখনও সুকুল খেলছেন ব্যাকে নয়, আক্রমণ বিভাগে।

১৯১০ সালে দেখা যাচ্ছে দলে এসেছেন কানু রায়, হাবুল সরকার, রাজেন সেনগুপ্ত ও মনোমোহন মুখার্জি। সে' বছরেও কিন্তু শীল্ডের প্রথম খেলাতে কানু রায় আক্রমণের নেতা এবং দ্বিতীয় খেলাতে তিনি ব্যাক। শিবদাস রাইট আউট, বিজয়দাস রাইট ইন। দ্বিতীয় খেলাতে মনোমোহন রাইট আউট, শিবদাস সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং বিজয়দাস লেফ্‌ট ইন।

শীল্ড প্রতিযোগিতার প্রথম দুই বৎসর ছিল মোহনবাগানের উদ্যোগ পর্ব। সে' পর্ব শেষ হল ১৯১১ সালে। সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে দলে এলেন তরুণ অভিলাষ ঘোষ। বিদায় নিলেন কয়েকজন রণ-ক্লান্ত কিন্তু যশোমণ্ডিত প্রবীণ সৈনিক। এখন দলে বয়োজ্যেষ্ঠ বিজয়দাস (৩০); সর্বকনিষ্ঠ রাজেন ও অভিলাষ (১৯)।

শিবদাসের বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বে দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের অবস্থান হল সুনিশ্চিত। দলের প্রত্যেকেই এখন বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে এখন চমৎকার সমঝোতা। এখন তারা এগার জন মিলে এক।

দল-নায়ক শিবদাসের সঙ্ঘবদ্ধতার উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোন কারণে একজন নিয়মিত খেলোয়াড় খেলতে অসমর্থ হলে তিনি দশ জন নিয়েই মাঠে নামতেন। ১৯১১ সালে শীল্ডের প্রথম খেলাতে তিনি তাই করেছিলেন। বদলি খেলোয়াড় সম্পর্কে শিবদাসের মনোভাব ছিল অত্যন্ত বিরূপ। শিবদাস বলতেন, "এক কলস দুধে এক ফোঁটা গো-মূত্র।"

১৯১১ সালে এ' দলের ক্রীড়ানৈপুণ্যে জনসাধারণ মুগ্ধ হল। মোহনবাগানের অপূর্ব সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উপর তাদের এখন পরিপূর্ণ আস্থা। তাই ১৯১১ সালে প্রাথমিক পর্যায়ের দুটি খেলার পরই জনসাধারণ হল মোহনবাগান কেন্দ্রিক।

* * *

১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার আদিতেও ছিল মোহনবাগান, অন্তেও ছিল মোহনবাগান।

পুরানো নথিপত্র থেকে দেখতে পাই যে সে' বৎসর শীল্ড খেলার সূচনা হয়েছিল ১০ই জুলাই এবং তার উপর যবনিকা পড়েছিল ২৯শে জুলাই। এই কুড়ি দিনব্যাপী অভিযানে মোহনবাগান ছয়টি খেলাতে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তৃতীয় খেলা থেকেই মোহনবাগানকে নিয়ে মেতে উঠেছিল জনসাধারণ।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে নির্ধারিত ছিল দুটি খেলা।

আহিরীটোলা কিন্তু খেলতে নামল না ক্যালকাটা দলের বিরুদ্ধে। দিনের একমাত্র খেলাটি অনুষ্ঠিত হল মোহনবাগান এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স

দলের মধ্যে। সে' খেলাতে ৩-০ গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। গোল করেছিলেন এ, ঘোষ ও বিজয় ভাদুড়ি (২)।

প্রায় দর্শকবিহীন মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ' খেলাটি। ট্রেড্স কাপে অসামান্য গৌরবের অধিকারী মোহনবাগান তখনই 'প্রিমিয়ার' ভারতীয় দল বলে স্বীকৃত হলেও ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালের শীল্ডের খেলাতে তারা তেমন কিছু কৃতিত্বের ছাপ রাখতে পারে নি। ছু' বারই তারা পরাজিত হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাতে। ১৯১১ সালে শীল্ডের আরম্ভে জনসাধারণের তাই মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না।

ইংলিশম্যান (১৩.৭.১১) প্রায় তাচ্ছিল্য ভরেই লিখেছিলেন যে 'বাবু'রা আশানুরূপ ভাবেই জয়লাভ করেছে। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ খেলাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের পাতাতেও মোহনবাগান নামাঙ্কিত দল নয়। একটি ভারতীয় দল মাত্র।

পরে অবশ্য তারা মোহনবাগানের পায়ে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। সে পরের কথা পরেই বলব।

খেলাটি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (১১.৭.১১) লিখলেন; "সোমবার রেঞ্জার্স মাঠে এ' ছুটি দলের মধ্যে বেশ ক্ষিপ্র ও আকর্ষণীয় খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় দল এ' দিন ৩-০ গোলে বিজয়ী হয়েছে।"

"খেলাটিতে বিশেষ দ্রুতগতি এবং চাতুর্যপূর্ণ ক্রীড়াকৌশল দেখা গিয়েছিল। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত দশ জনে খেলেও ভারতীয় দলটি খেলাতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কলেজ দলের রক্ষণ বিভাগ প্রথমার্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়ে কিছু সুযোগের সৃষ্টি করলেও আক্রমণ বিভাগ সে' সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি।"

"ভারতীয় দলের পুরোভাগের তীব্র আক্রমণের চাপে কলেজ দলের রক্ষণ বিভাগ অল্প সময়ের মধ্যেই শিথিল হয়ে গেল। ভারতীয় দলের

আক্রমণে প্রশংসনীয় তীব্রতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছিল। এ' কারণেই কলেজ দল শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল।"

"প্রথমার্ধের মাঝামাঝি অভিলাষ ঘোষ প্রথম গোলটি করেন। দিক পরিবর্তনের পর বি, ভাদুড়ি দুটি গোল করে ভারতীয় দলকে উপরোক্ত প্রকারে বিজয়ী করেন। বিজয়ী দলের পক্ষে সুকুল, সেনগুপ্ত, এস, ভাদুড়ি এবং এ, ঘোষ উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।"

নিম্নে প্রদত্ত দল গঠন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ' দিনের খেলাতে সুধীর চ্যাটার্জি ও জে, রায় অংশ গ্রহণ করেন নি। ব্যাকে খেলেছিলেন নীলমাধব এবং শিবদাস ছিলেন রাইট আউট। মোহনবাগান আগাগোড়া খেলেছিল দশ জনে।

মোহনবাগান : এইচ, মুখার্জি ; এ, সুকুল ও এন, ভট্টাচার্য ; এম, মুখার্জি, আর, সেনগুপ্ত ও হাবুল সরকার ; এস, ভাদুড়ি (অধিনায়ক , বি, ভাদুড়ি, এ, ঘোষ ও এন, ঘোষ।

সেন্ট জেভিয়ার্স : সার্কিস ; রোজ ও গ্র্যাসনি ; পুসে, ফিসার ও ফেরিস ; ওয়ার্ড, ফ্রান্সিস, সাইকিস, কলিন্স ও নিল।

রেফারী : হোলি।

সূচনা শুভ হল।

তবু মাতামাতি করার মত কিছু নয়। আগের বছরও এ' দলের বিরুদ্ধে শীল্ডের খেলাতে বিজয়ী হয়েছিল মোহনবাগান। দেখা যাক, এ'বার দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাতে জিততে পারে কি না ? ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে দ্বিতীয় খেলাতেই মোহনবাগানের হার হয়েছিল। এ'বার যদি জিততে পারে তা'হলে হয়ত কিছু আশা পোষণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় খেলা রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে। খেলা ছিল ১৪ই জুলাই।

"সেদিন খেলার আগে হল জোর বৃষ্টি। জল জমে কাষ্টম্‌স মাঠ পিচ্ছিল (Slusby) হয়ে গেল।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭.৭.১১)

দল হিসাবে রেঞ্জার্স নিতান্ত দুর্বল ছিল না। তার উপর বুট পায়ে খেলে বলে এমন মাঠে তারা নিশ্চয়ই বাড়তি সুবিধা পাবে। নগ্নপদ মোহনবাগানের উপর আস্থা স্থাপনের মত সাহসী বাঙ্গালী দর্শক-সেদিন খুব বেশী ছিল না। সকলেই ভাবছে, আজ হয়ত মোহনবাগানের সলিল সমাধিই ঘটবে। তবু দুর্গা নাম জপ করতেই মাঠে ভীড় হয়েছিল মন্দ নয়।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (১৫.৭.১১) বলেছিলেন, "দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও মাঠে এদিন এসেছিল অনেক লোক।"

প্রতিকূল মাঠে প্রশংসনীয় দৃঢ়তা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মোহনবাগান সে' খেলাতে জিতেছিল ২-১ গোলে। প্রথমার্ধেই মোহনবাগান দু' গোলে এগিয়ে ছিল। প্রথম গোল করেছিলেন বিজয়দাস এবং দ্বিতীয় গোল করেছিলেন শিবদাস। রেঞ্জার্স দলের হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেছিলেন অ্যালেন।

তখনও ইংলিশম্যান, ষ্টেট্‌সম্যান প্রমুখ সাহেবী মালিকানার সংবাদপত্রগুলির বোধোদয় হয় নি। ইংলিশম্যান খেলার আগেই মন্তব্য করেছিলেন যে এ' দু' দলের মধ্যে কে বিজয়ী হবে বলা যায় না। তবে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে সামান্যতম ব্যবধানে। 'বাবু' মোহনবাগান হারলে হয়ত তাদের পাঠকদের জন্য কিছু সংবাদ সৃষ্টি হত। কিন্তু পরাজিত হয়েছে রেঞ্জার্স, সুতরাং অলমতি বিস্তারেণ। চেপে যাওয়াই ভালো। তাদের জীর্ণ পাতাগুলিতে এ' খেলার কোন বিস্তৃত বিবরণ নেই। কেবল তাদের উপর নির্ভরশীল হলে অতীতের অন্ধকার থেকে এ' খেলাটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হত না।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ অবশ্য একটি বিবরণ পেশ করেছিলেন।

কেবল তাদের কথা শুনেই হয়ত বর্তমান ফুটবল রসিকদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। সুখের বিষয়, তারও প্রয়োজন হবে না।

ভাগ্য ভাল বর্তমান কালের ফুটবল প্রেমিকের। সেই সুদূর অতীতেও মোহনবাগানের খেলাগুলির বিবরণ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন এক বেদব্যাস। তার আসল নাম অবশ্যই বেদব্যাস নয়। পরিণত বয়সে বিদ্রোহের কবিতা শোনাবার জন্য কবিগুরু সৃষ্টি করেছিলেন মানস-পুত্র নিবারণ চক্রবর্তীকে। সে' যুগে এ' কালের জন্য সেই বেদব্যাসকে উপস্থিত করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা।

খেলাধূলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনীহা না হলেও ১৯১১ সালে অমৃতবাজারের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তবু তারাই এক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বনামে মোহনবাগানের খেলাগুলির বিবরণ লেখার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। জানি না অমৃতবাজার কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বলে মোহনবাগানের চরম সাফল্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কিনা। কিন্তু ক্রীড়া-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সেদিন এ' ছিল একটি অকল্পনীয় উদ্যোগ। খেলার বৃত্তান্ত এবং সমালোচনা স্বনামে লেখার দৃষ্টান্ত ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে সেই সর্বপ্রথম।

সেই বেদব্যাসের প্রকৃত নাম গণেন মল্লিক। আজ তাকে ভারতীয় ক্রীড়া-সাংবাদিক গোষ্ঠীর পূর্বসূরী রূপে জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার।

তবু ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের (১৫.৭.১১) বিবরণই তুলে ধরব আগে। তাদের লেখাতেও মোহনবাগানের—অবশ্য এখনও একটি ভারতীয় দল মাত্র—শক্তির যে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা'ও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। লিখলেন এ' সংবাদপত্র ঃ

"দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া মাথাতে করেও এদিন মাঠে এসেছিল অনেক লোক। শুক্রবার শীল্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ে এ' দু' দলের মধ্যে ক্ষিপ্র ও তীব্র প্রতিযোগিতার পর খেলাটি সামান্যতম ব্যবধানে মীমাংসিত হয়েছে। ভারতীয় দলটি জিতেছে ২-১ গোলে।"

"খেলার সময়েও বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠ হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত পিচ্ছিল। বল হয়ে উঠেছিল বালির বস্তার মত ভারী। এ' কারণেই নির্ভুল বল আদান প্রদান এবং ইচ্ছামত লক্ষ্যভেদ ছিল প্রায় অসম্ভব। কোন কোন খেলোয়াড়কে দৈহিক শক্তির অপব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে এবং রেফারীও তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।"

'বাবু' দল যদি এ' অপরাধে অভিযুক্ত হত তা' হলে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ এমন সান্ধ্য ভাষাতে কথা কইতেন না। 'বাবু'দের কিছু উপদেশ অন্ততঃ দিতেনই। কাজেই কোন দলের খেলোয়াড়েরা গায়ের জোর ফলিয়েছিলেন তা' সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

বলছেন এই সংবাদপত্র, "খেলার প্রথম দিকে উভয় দলই সমান ভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু রক্ষণ বিভাগের খেলোয়াড়েরা তখন খেলাতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয় দলের আক্রমণে শুধু যে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল তা' নয়। তাদের গতিও ছিল দ্রুততর এবং খেলা ছিল চাতুর্যপূর্ণ।"

"তুলনামূলক ভাবে বলতেই হবে যে রেঞ্জার্সের আক্রমণ আশানুরূপ হয় নি। তারা তবু বহু সুযোগ পেয়েছে এবং নষ্ট করেছে। অনেকবার বল নিয়ে রেঞ্জার্স শত্রুর সীমানাতে প্রবেশ করেছে কিন্তু লক্ষ্যভেদের শোচনীয় দুর্বলতার জন্য প্রতিপক্ষের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি। রেঞ্জার্স দলের সেন্টার-হাফ কোডি এ'দিন চমৎকার খেলেছিলেন।"

"ভারতীয় দলের হাফ-ব্যাকেরা কেবল রক্ষণ কার্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে নি; আক্রমণেও প্রচুর সহায়তা করেছে। রাজেন সেনগুপ্ত এ'দিন প্রচুর খেটে খেলেছিলেন। আক্রমণে রাইট আউট রায় ছিলেন মাঠের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।"

"রেঞ্জার্সই প্রথমে কিছুক্ষণ বিফল আক্রমণ করে। তারপর ভাদুড়িরা দু' ভাই একটি আক্রমণ রচনা করে বল দেন ঘোষকে, কিন্তু চ্যাণ্ডলার তখন তার গতিরোধ করেন। শিবদাস অতঃপর একাই বল

নিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি কর্ণার আদায় করেন কিন্তু গোলরক্ষক মোলের তাতে কোন অসুবিধা হয় নি। একটু পরে বিজয়দাস গোল করার চেষ্টা করলে মোল তাকে বিফল মনোরথ করেন।"

"এ' সময়ে রেঞ্জার্স একটু চাপের সৃষ্টি করে। স্মার্ট কয়েক জনকে কাটিয়ে পাশ দিলে লটন লম্বা পাল্লার সটে গোল করার চেষ্টা করেন। হীরালালের সে' বল ধরতে একটু অসুবিধা হল, কিন্তু কোডি তখন বাইরে মেরে একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন।"

"বিরতির কয়েক মিনিট পূর্বে চ্যাণ্ডলার একটি মিস-কিক করলে সে' বল ধরেই বিজয়দাস প্রথম গোলটি করেন। ভারতীয় দর্শকেরা বিশাল গর্জনে গোলটিকে স্বাগত জ্ঞাপন করে। এ' সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রায় দক্ষিণ পার্শ্বের লাইন ধরে কয়েক জনকে ক্ষিপ্র গতিতে কাটিয়ে সেণ্টার করলে একটি জটলার সৃষ্টি হয় এবং ছোট ভাদুড়ি (শিবদাস) সে' সুযোগে দ্বিতীয় গোলটি করেন। এ'ভাবে ভারতীয় দলটি বিরতির সময় ২-০ গোলে অগ্রগামী হল।"

"বিরতির পর উভয় দলই কিছুক্ষণ সমান তালে আক্রমণ করল। অ্যালেন একবার গোলের সম্মুখীন হলে সুকুল কর্ণার করে তাকে নিবৃত্ত করলেন। তারপর একটি ফাউল থেকে রেঞ্জার্স দলের কিঞ্চিৎ বিপদের সৃষ্টি হল। ভারতীয় দলটি এ' সময়ে অত্যন্ত আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে খেললেও আর কোন গোল করতে সমর্থ হল না।"

"দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি অ্যালেন আর একবার বল নিয়ে অগ্রসর হলে সুকুল তাকে নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে ফাউল করলেন, কিন্তু স্মার্টের পেনালটি কিক হীরালাল অদ্ভুত কৃতিত্বে রক্ষা করলেন। অতঃপর রেঞ্জার্স প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল এবং খেলা শেষ হবার কিছু পূর্বে অ্যালেনই একটি গোল পরিশোধ করলেন।"

এখন খেলাটি সম্পর্কে গণেন মল্লিকের বক্তব্য।

লিখছেন গণেন মল্লিক (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭. ৭. ১১),

'লাল-সবুজ জার্সি গায়ে মোহনবাগান দলই শিবদাস ভাদুড়ির নেতৃত্বে প্রথম মাঠে নেমেছিল। উভয় দলই ছিল পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন। কিছুক্ষণ খেলার পর রেঞ্জার্স ই প্রথম প্রতিপক্ষের উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। লটন দূর থেকে একটি জোরাল সট করলে মোহনবাগানের গোলের সম্মুখে বিপদের সৃষ্টি হল। সে' বিপদ কোন রকমে কাটিয়ে উঠে ডুরাণ্টের বিরুদ্ধে ফাউলের জন্য মোহনবাগান একটি ফ্রি কিক পেল। কিন্তু তাতেও রেঞ্জার্স দলের চাপের লাঘব হল না। মোহনবাগানের রক্ষণ বিভাগের ত্রুটির জন্য রেঞ্জার্স অতঃপর একটি ব্যর্থ কর্ণার পেল।"

বলে চলেছেন গণেন মল্লিক, "এখন কিন্তু খেলার গতির বিরুদ্ধেই হঠাৎ অগ্রগামী হল মোহনবাগান। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সাময়িক ভাবে প্রতিহত করে শিবদাস ও বিজয়দাস বামদিক দিয়ে সম্মিলিত ভাবে একটি আক্রমণ রচনা করলেন। রেঞ্জার্সের রক্ষণ ভাগ ভেদ করে শিবদাস গোল লাইনের কাছে গিয়ে ব্যাক পাশ করলে বিজয়দাস প্রথম গোলটি করেন।"

"এ' অপ্রত্যাশিত গোলে দর্শকেরা আনন্দে হইচই করে উঠল। গোলটি ছিল সম্পূর্ণই আকস্মিক। কিন্তু অল্প পরেই শিবদাস একক কৃতিত্বে করলেন দ্বিতীয় গোলটি। বিরতির সময় মোহনবাগান ২-০ গোলে অগ্রগামী। শিবদাস ও বিজয়দাসের ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলে মুগ্ধ।"

মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ এবং অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণে কিছু অমিল রয়েছে। কিন্তু এত দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এবং অন্য সংবাদপত্রের ভাষ্যের অভাবে এখন এ' অমিলের মীমাংসা সম্ভব নয়। এ' সামান্য গরমিলে মূল বক্তব্যের কোন ইতর বিশেষও হবে না।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সম্বন্ধে বলছেন অমৃতবাজার পত্রিকা, "খেলার গতি এখন দ্রুততর হল। একবার এদিক, একবার ওদিক চলল আক্রমণ, আর পালটা আক্রমণ।"

"এমন সময় ঘটল এক বিপত্তি। স্বকুলের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত অপরাধে মোহনবাগানের ঘনিয়ে এল মহা বিপদ। রেঞ্জার্স দলের একটি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে জলসিক্ত মাঠে স্বকুলের পা পিছলে গেল। টাল সামলাতে তিনি রেঞ্জার্স দলের একজন খেলোয়াড়ের গলা জড়িয়ে ধরলেন। বল কিন্তু তখন ধারে কাছে কোথায়ও নেই।"

গণেন মল্লিক না থাকলে লঘু পাপে মোহনবাগানকে কেমন গুরু দণ্ড দেওয়া হয়েছিল তা' আমাদের অজানা থাকত। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ ফাউলের উল্লেখ করেছেন মাত্র। কেমন করে সে' ফাউল হল এ' সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। এখন পরিষ্কার হল সে' ফাউলের রহস্য।

"বাজল বাঁশী, হল ফাউল," লিখছেন গণেন মল্লিক। "সে' ফাউল হল নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে; সুতরাং হল পেনালটি। শ্রুতিগোচর স্তব্ধতা নেমে এল মাঠে। পেনালটি কিক হল। হীরালাল সে' পেনালটি বাঁচিয়ে দিলেন। হাতে ধরে নয়, পায়ে লাথি মেরে সে' বিপদ কাটিয়ে দিলেন হীরালাল। তুমুল হর্ষ-ধ্বনিতে অভিনন্দিত হলেন মোহনবাগানের বীর গোলরক্ষক।"

এখানে গল্পের খেই ছেড়ে একটু অন্য গল্প করছি।

হীরালাল বাবুর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে এ' পেনালটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। পদ্মশ্রী গোষ্ঠপাল এবং ৺পল্টু দাশগুপ্তের মুখে প্রথম শুনেছিলাম যে শীল্ডের খেলাতে হীরালাল একটি পেনালটি বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু কোন খেলাতে সে' পেনালটি হয়েছিল সে' সম্বন্ধে ছিল তাদের মধ্যে মতভেদ।

সে' কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম হীরালাল বাবুকে। তখন তিনি সত্তর পেরিয়েছেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং স্মৃতিও খুব প্রখর নয়। তাঁর নিজের ধারণা ছিল যে তিনি পেনালটি রক্ষা করেছিলেন রাইফেল ব্রিগেড

দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেমন করে তা' রক্ষা করেছিলেন সে' সম্বন্ধে তাঁর বিনয়নম্র বিবরণ আজও আমার মনে পড়ছে।

বলেছিলেন হীরালালবাবু, "পেনালটি হল। কি আর করা যাবে? মনের ভয় চেপে বেশ বুক ফুলিয়েই দাঁড়ালাম গোল লাইনের একটু সামনে। হেলছি দুলছি—একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। কে কিক করেছিল ঠিক মনে করতে পারছি না। অনেক দিন ত হল! তবে তেড়েমেড়ে যখন কিক করল তখন, সত্যি বলছি, আমাতে আর আমি নেই। কিন্তু হঠাৎ যেন পায়ে কি লাগল। ও ভগবান! পেনালটি বেঁচে গেছে।"

গর্ব নেই, বড় কথা নেই। বললেন কি না যে পেনালটি বেঁচে গেছে।

বলা বাহুল্য, পেনালটি অপচয় করে রেঞ্জার্স বা রেঞ্জার্স দলের সমর্থকেরা উল্লসিত হয় নি। ভেঙ্গেও কিন্তু পড়েনি তারা। বলছেন গণেন মল্লিক, "তারপর তারা চালাল প্রচণ্ড আক্রমণ, কিন্তু রাজেন, সুকুল ও সুধীর কোনক্রমে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন। তা' সত্ত্বেও খেলা শেষ হবার আগে অ্যালেনের সাহায্যে রেঞ্জার্স একটি গোল পরিশোধ করল।"

সমালোচক হিসাবে গণেন মল্লিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল এবং দূরদৃষ্টিরও অভাব ছিল না তার। রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার পরই তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকাতে (১৭.৭.১১) মন্তব্য করলেন,

"মোহনবাগানের রক্ষণ বিভাগ সুদৃঢ়; তাদের আক্রমণেও আছে সঙ্ঘবদ্ধতা এবং আকস্মিক তীব্রতা। এ' দল সেমি-ফাইন্যালে না উঠলে সকলেই নিরাশ হবে।"

মোহনবাগান: এইচ, মুখার্জি; এ, সুকুল ও এস, চ্যাটার্জি; এম, মুখার্জি, আর, সেনগুপ্ত ও এন, ভট্টাচার্য; জে, রায়, এস, সরকার, এ, ঘোষ, বি, ভাদুড়ি ও এস, ভাদুড়ি (অধিনায়ক)।

রেঞ্জার্স ঃ মোল ; ভিনি ও চ্যাণ্ডলার ; লটন ; কোডি ও লিন্‌ডসে ; ডানষ্টার ; এ, লটন ; অ্যাল্লেন ; স্মার্ট ও ডুরান্ট।

রেফারী ঃ সার্জেন্ট হস্‌কিন্‌স।

মোহনবাগান ২-১ গোলে বিজয়ী হয়ে উঠল তৃতীয় পর্যায়ে। দ্বিতীয় সোপানে আগে দু' দুবার পদস্খলন হয়েছিল। এ'বার কিন্তু তৃতীয় সোপানে আরোহণ হল।

এখন জ্বলে উঠল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। জনসাধারণ যেন এক যাদুমন্ত্রে আকাশে বাতাসে শুনতে পেল শীল্ড ঘরে আসার পদধ্বনি। হয়ত, সম্পূর্ণ ই গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। তবু উচ্ছল হল, উত্তাল হল তারা।

মুক্ত ধারা প্রবাহের সূচনা হল।

* * * *

এতদিন ছিল খেলা খেলা ; এবার কিন্তু জবর খেলা।

কোয়ার্টার-ফাইন্যালের খেলা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাইফেল ব্রিগেড ' কেল্লার সৈনিক দল।

সে' বছর লীগের খেলাতে রাইফেল ব্রিগেড তেমন কৃতিত্বের ছাপ রাখতে না পারলেও এ' সৈনিক দল যে বিশেষ শক্তিধর এ' বিষয়ে কোন মতভেদ ছিল না। তার উপর তারা স্থানীয় দল। মাঠ তাদের পরিচিত এবং যদিও লীগে মোহনবাগান এখনও অপাংক্তেয়, তথাপি সৈনিক দলটির নিকট তারা একেবারে অপরিচিত নয়।

সাহেব সুবোদের মুখে বাঁকা হাসি। দুটি খেলাতে মোহনবাগানের জয়লাভের পর জনসাধারণের আনন্দের আতিশয্যে সাহেবরা মনে মনে ক্ষুব্ধ। বড্ড বাড় বেড়েছে বাবুদের। সাহেবরা এখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন যে ঘুঘু এতদিন ধান খেয়েছে ; এবার প্রাণ যাবে। এবার আর সেন্ট জেভিয়ার্স বা রেঞ্জার্সের মত দলের সঙ্গে

খেলা নয়। এখন খেলতে হবে সৈনিক দলের সঙ্গে। খেলার আগেই বাবুদের হারিয়ে রাখলেন সাহেবরা।

মোহনবাগান সমর্থকদেরও হিয়া দুরু দুরু।

শীল্ডে সৈনিক দলের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের ফলাফল সম্বন্ধে তাদের মনেও আশংকার অভাব নেই। মোহনবাগান সম্বন্ধে যতই তাদের দুর্বলতা থাক, প্রতিপক্ষের শক্তিকে উপেক্ষা করার মত ভুল জনসাধারণ কখনও করে না। সৈনিক দলের বিরুদ্ধে সহজলভ্য হবে না বিজয়ীর সম্মান, এ'কথা তাদের অজানা নয়।

তারা আরো জানে, আগের বছর অর্থাৎ ১৯১০ সালে এই রাইফেল ব্রিগেড দলের হাতেই ১-০ গোলে মোহনবাগানের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু সে' দিন ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। এখন ত তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা। তাই তারা আশাহীন হয়েও আশা করছে। ভাবছে যে ফলাফল এ'বার হয়ত অন্য রকম হতে পারে।

পূর্ব পরাজয়ের তিক্ত স্মৃতি তারা ভোলে নি। এ'বার তারা চায় সে' পরাজয়ের প্রতিশোধ। পরবর্তী খেলাতে মোহনবাগান যদি হেরেও যায় সে' নিরাশা তারা বাধ্য হয়েই সহ্য করবে। কিন্তু আবার যখন ভাগ্যক্রমে দু' দলের দেখা হয়েছে তখন চাই প্রতিশোধ। তাই, জনসাধারণও এখন "দেখা যাবে" বলে সরব হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের মনে এখন একটিমাত্র কামনা—জয়ং দেহি।

তা'ছাড়া ১৯১০ সালের অসম প্রতিযোগিতার কথাও এখন তাদের মনে পড়ছে। সে'দিন আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছিল। মাঠ ছিল অত্যন্ত নরম ও পিচ্ছিল। বল পাঁকাল মাছের মত ফসকে যাচ্ছিল। সবুট সৈনিক দলের বিরুদ্ধে নগ্নপদ মোহনবাগান দল তবু বুক চিতিয়ে লড়েছিল। হেরেছিল মাত্র এক গোলে।

তাই 'জয়ং দেহি'র সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রার্থনা করছে শুকনো মাঠের জন্য। সৈনিক দলকে ভয় নেই; ভয় প্রকৃতির বিশ্বাসঘাতকতাকে।

দুই যুযুধান শিবিরের উপরোক্ত মনোভাব কল্পনা নয়। এই মনোভাবই মাঠে টেনে এনেছিল অভূতপূর্ব এক জনতা। এ' জনতার উপস্থিতিই খেলাটির অন্তর্নিহিত উত্তেজনার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তা' নইলে শীল্ডের তৃতীয় পর্যায়ের সামান্য খেলাতে এমন অসামান্য জন-সমাগম হত না। সাহেবরা এবং বাঙ্গালীরা উভয়েই এসেছিল জয়ের আশা নিয়ে। এক দল বলছে, "দেখে নেব"; আর এক দল বলছে, "দেখা যাবে"।

তাই এ' খেলাতে ভীড় নয়, ঘটেছে জন-বিস্ফোরণ।

এ'দিন মাঠে বিশাল জনতার উপস্থিতি এবং তাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা সম্পর্কে প্রায় একই চিত্র তুলে ধরেছেন সমসাময়িক সব সংবাদপত্র। নেটিভ জনতা ইংলিশম্যানের চক্ষুশূল। তাই কেবল "প্রচণ্ড ভীড়" বলেই এ' কাগজ (২০.৭.১১) এড়িয়ে গেলেন। ষ্টেট্‌সম্যান (২০.৭.১১) বলেছিলেন, "কলিকাতার ফুটবলের পক্ষেও এ'দিনের খেলার পূর্বের এবং পরের দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব। বিকাল চারটাতেই মাঠে বিশাল ভীড়। বিশ ত্রিশ মাইল দূর থেকেও এসেছিল বহু লোক। সাড়ে পাঁচটার আগেই মাঠে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না।'

গণেন মল্লিক লিখেছিলেন, "এ' সন্ধ্যার জনতা ফুটবল ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কম করেও মাঠে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক। আসতে আরম্ভ করেছিল তারা বেলা দুটো থেকেই।"

চল্লিশ হাজার লোকের ডাক ভগবানের কানে পৌঁছেছিল। খেলার দিন বৃষ্টি হল না। সোনালী রোদমাখা সুন্দর প্রভাত; রক্ত-রাঙ্গা মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে সুন্দরতর সন্ধ্যা।

১৯শে জুলাই ডালহৌসি মাঠে মুখোমুখি দাঁড়াল আগের বছরের দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী—মোহনবাগান, আর রাইফেল ব্রিগেড।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল, কিন্তু আংশিক পুনরাবৃত্তি মাত্র। এ'বার

জিতল মোহনবাগান ১-০ গোলে। শোধবোধ হল। কিন্তু অনেকেই বললেন যে খেলার একমাত্র গোলটি নাকি ভাগ্যের অবদান। বিস্মৃত হলেন তারা যে আগের বছর কর্দমাক্ত মাঠে মোহনবাগানের পরাজয়ও ছিল ভাগ্যের পরিহাস। সিংহবিক্রমে খেলেই মোহনবাগান এ'দিন জিতেছিল।

"নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"

এখানে ১৯১১ সালের আবহাওয়া নিয়ে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুকনো মাঠে খেলে মোহনবাগান হারিয়েছিল রাইফেল ব্রিগেডকে। তবে কি শুকনো মাঠের কৃপাতেই শেষ পর্যন্ত আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল মোহনবাগান? এ' সন্দেহ হয়ত ইতিমধ্যেই অনেকের মনে জেগেছে। আবহাওয়ার আলোচনা তাই নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

শুকনো মাঠেই ভারতীয় দলের খেলার জলুস খোলে, এ' কথা স্বীকার করতে দ্বিধার কোন কারণ নেই। কিন্তু শীল্ড প্রতিযোগিতা হত জুলাই মাসে, শেষ আষাঢ়ে এবং মাঝ শ্রাবণে। তখন ঘোর বর্ষা। এ' পরিস্থিতিতে উপর্যুপরি তিনটি সৈনিক দলের বিরুদ্ধে নগ্নপদ মোহনবাগান দলের জয়লাভে আজ অনেকের মনেই হয়ত সন্দেহ হতে পারে যে সে' বৎসর বোধ হয় তেমন ঘন-ঘোর বর্ষা ছিল না। হয়ত শুকনো মাঠের অপ্রত্যাশিত সহায়তাই এসেছিল মোহনবাগানের সাফল্য।

তা' কিন্তু সত্য নয়।

মৌসুমি বায়ু সে' বছর অবশ্য কিছু দুর্বলই ছিল। এ' তথ্য জানা যাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তরের সংবাদে। কিন্তু সে' বছর অতিবৃষ্টি না হলেও মোটেই অনাবৃষ্টি ছিল না।

সংবাদপত্রের বিবরণে ইতিপূর্বে জানা গিয়েছে যে রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে খেলাতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। বৃষ্টিতে মাঠ হয়েছিল

পিচ্ছিল। ১৯শে জুলাই রাইফেল ব্রিগেডের বিরুদ্ধে খেলার দিনটি রোদে ঝলমলে ছিল। কিন্তু ভোর রাতে সামান্য ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছিল।

সেমি-ফাইন্যালে মিডল্‌সেক্‌স দলের সঙ্গে প্রথম খেলার দিন আবার বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টি ছিল না সেণ্ট জেভিয়ার্স দলের বিরুদ্ধে শীল্ডের উদ্বোধনী খেলার দিন। আর বৃষ্টি ছিল না ইষ্ট ইয়র্ক্‌স দলের বিরুদ্ধে ফাইন্যাল খেলার দিন। সুতরাং, দীর্ঘ শীল্ড প্রতিযোগিতাতে আবহাওয়া সকল সময়েই মোহনবাগানের অনুকূলে ছিল এমন কথা বলা চলবে না।

রাইফেল ব্রিগেড দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান মাঠে জিতেছিল মাত্র এক গোলে। কিন্তু মাঠের বাইরে মোহনবাগান সে' দিন অসামান্য কি জিতেছিল তা' বুঝতে হলে ইঙ্গ-সমাজের আকস্মিক পরিবর্তিত মনোভাবের প্রতি ভাল করে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

এতদিন ছিল হেলা ফেলা, এ' বার হল কোলে তোলা।

এতদিন কেবল 'বাবু' দল, কিংবা নগণ্য একটি ভারতীয় দল। এ' খেলার আগে পর্যন্ত মোহনবাগানের যেন নাম নেই। ট্রেড্‌স কাপে অসাধারণ গৌরব অর্জনের পর সাহেবরা বাধ্য হয়েই মোহনবাগানকে 'প্রিমিয়ার' ভারতীয় দল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তখন কি তারা ভেবেছেন যে এ' দল এত শীঘ্রই ফুটবলের শীর্ষ সম্মান কেড়ে নেবার জন্য লোভী হাত বাড়াবে? তাই শীল্ড প্রতিযোগিতার গোড়াতে তারা ভাবছেন যে সেণ্ট জেভিয়ার্স 'বাবু' দলের চমক লাগিয়ে দিতে পারে। রেঞ্জার্স ত' বেগ দেবেই, জিতেও যেতে পারে। তাই দুটি খেলাতে বিজয়ী হবার পরও ইঙ্গ-সমাজের মুখপাত্র বলে সম্মানিত সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠাতে নামাঙ্কিত নয় মোহনবাগান।

গালে কিন্তু চড় খেল সাহেবরা রাইফেল ব্রিগেডের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে। এখন কেমন করে মোহনবাগানকে সামান্য ভারতীয় দল বলে

অশ্রদ্ধা করবে ? 'বাবু' দল বলে তাচ্ছিল্য দেখাবে ? বাধ্য হয়েই সংযত করতে হল রসনা, সংহত করতে হল লেখনী।

রাতারাতি ভোল পালটে সর্বাগ্রে ইংলিশম্যান (২০. ৭. ১১) স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, "গত সন্ধ্যার উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল মোহনবাগান এবং রাইফেল ব্রিগেড দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।" এ' কথা বলে জয়লাভের জন্য তারা অভিনন্দনও জানালেন মোহনবাগানকে।

কিন্তু, একি বাণী শুনি আজি মন্থরার মুখে !

রাইফেল ব্রিগেডকে হারিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান। সুতরাং ইংলিশম্যানের চক্ষু এখন কপালে উঠেছে ; কিংবা এখন তাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলীত হয়েছে। এখন আর তাই 'বাবু' বলে বিদ্রূপ নেই। একেবারে মোহনবাগান বলে সম্ভাষণ। মোহনবাগানের খেলাকেই উল্লেখযোগ্য বলে স্বীকৃতি এবং তাদের জয় লাভেই অভিনন্দন।

ঘাড় ছেড়েই পায়ে হাত। সেই রাম বাড়ুজ্যের হাল।

গাঁয়ের মাথা ছিলেন রামচন্দ্র বাড়ুজ্যে। জোত জমা এবং লগ্নী কারবারের প্রসাদে অর্থ করেছেন প্রচুর। হাঁক-ডাকের অন্ত নেই। গৃহিনীও গরবিনী এবং একমাত্র মেয়েও দেমাকি।

দু' হাজার টাকা নগদ পণ কবুল করে বাড়ুজ্যে মশাই মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন। কিন্তু আরো বেশী পণ দিয়ে সে' বর ভাগিয়ে নিল অন্য লোক। বাড়ুজ্যে মশাই কিছুই জানতে পারলেন না। বিয়ের লগ্নে বর এলো না। মাথায় বজ্রাঘাত হল রামচন্দ্র বাড়ুজ্যের। জাত, কুল সব যাবার উপক্রম।

কন্যা লগ্নভ্রষ্টা হলে সর্বনাশ। গাঁয়ে ছিল শ্রীদাম মুখুজ্যে। তার বিধবা মা এ' বাড়ী সে' বাড়ী রান্না করে, আর ছিদাম লোকের ফাইফরমাশ খাটে। বাড়ুজ্যের বৈঠকখানার এক কোণেই রাতে মাথা গোঁজে। লোকে কাজ করিয়ে নেয় বটে, কিন্তু ছিদাম বলেও ডাকে

না। সবাই বলে—ছিদে। সেই ছিদেকে ধরে এনেই রাম বাড়ুজ্যে তার জাত কুল, মান সম্মান বাঁচালেন।

মুস্কিল হল বিয়ের পর।

মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু রামচন্দ্র বাড়ুজ্যে এ' চালচুলোহীন ছিদেকে ডাকবেন 'বাবাজী' বলে? বাড়ুজ্যে গিন্নীই বা তাকে মাছের মুড়ো দিয়ে কি করে ভাত দেবেন? দেমাকি মেয়েও ফোঁস করে, "বিয়ে হয়েছে ত' হয়েছে। তাই বলে ছিদেকে আমি পেন্নাম করব?"

সব শুনে ছিদে দেশান্তরী হল। ফিরে এল পাঁচ বৎসর পর। সেই ছিদে আর নেই। তামাকের কারবারে পয়সা করেছে। এখন পরনে কাঁচি ধুতি, লম্বা কোচা; ইস্ত্রি করা সার্টের উপর বুক খোলা কোট এবং তার উপর চেন ঘড়ি। একেবারে শ্রীদামবাবু।

গাঁয়ে এসে জায়গা, জমি, পুকুর ইত্যাদি কিনল; পাকা বাড়ী করল। মাকে দিল গরদ কিনে। কালীমন্দির মেরামত করিয়ে দিল। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর দিকে ফিরেও তাকাল না।

বেগতিক দেখে রাম বাড়ুজ্যে প্রায় জামাই-এর পায়েই হাত দিলেন। হাত কচলাতে কচলাতে নিজেই জামাই-এর বাড়ী এসে মুখ কাঁচুমাচু করে ডাকলেন, "বাবাজী"। বেয়ানকে সবিনয় নমস্কার নিবেদন করলেন। নেমন্তন্ন করলেন জামাইকে।

জামাই গেল শ্বশুর বাড়ী। সে' কি ঘটা! লম্বা ঘোমটা টেনে মেয়েই এসে সকলের আগে পতি পরম গুরুর পায়ের ধুলো নিল। শ্বাশুড়ী পঞ্চ ব্যঞ্জন এবং মাছের মুড়ো সাজিয়ে ভাত দিয়ে পাখা নিয়ে বসলেন হাওয়া করতে।

ইংলিশম্যানেরও এখন ঠিক এই অবস্থা। 'বাবু'কে মোহনবাগান ত' বলেছেই। আরো একটু উদারতা দেখিয়ে এ' সংবাদপত্র (২০.৭.১১) মন্তব্য করলেন, "কেল্লার দলটির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে বলে মোহনবাগান অভিনন্দনের পাত্র"।

'বাবাজী' বলে ডাক হল, মাছের মুড়োও পাতে পড়ল। মেয়েও করল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম। তা' ফাইন্যালের পর মোহনবাগানের পায়ে গড়াগড়ি দিয়েছিল ইংলিশম্যান।

তবু কপটতার আড়ালে মনের দুঃখ কত চেপে রাখবেন? মোহনবাগানকে অভিনন্দন জানিয়েও ইংলিশম্যান আক্ষেপ করতে বিরত হলেন না। বললেন, "সৈনিক দল হেরেছে সম্পূর্ণ নিজের দোষে। গোল করার সুযোগ তারাই পেয়েছিল বেশী। কিন্তু লক্ষ্যভেদের শোচনীয় দুর্বলতার খেসারত দিতে হল সৈনিক দলকে।"

উপস্থিত জনতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলির মতামত আগেই উল্লেখ করেছি। খেলার কথা বলতে গিয়ে গণেন মল্লিক অমৃতবাজার পত্রিকাতে লিখেছিলেন, "এ' দিন টসে জিতেছিলেন শিবদাস। ৫-৪৫ মিনিটে বেজফোর্ড বল মেরে খেলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উঠল এক গগনভেদী চীৎকার। তারপর—তারপর মাঠে নেমে এল তুহিন শীতল নীরবতা।"

খেলার উপর ইংলিশম্যানের ভাষ্যের কথা বলেছি। ষ্টেট্‌সম্যান (২০.৭.১১) লিখলেন, "সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় দল এগিয়ে গেল বল নিয়ে, কিন্তু তখন জে, রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। তার সট গেল পোষ্টের বাইরে। সৈনিক দল আক্রমণ তৎপর হল কিন্তু পন্‌সফোর্ড গোল করার চেষ্টা করলে হীরালাল সে' বল ধরলেন অনায়াসে।"

"অতঃপর কিছুক্ষণ খেলাতে সৈনিক দলের প্রাধান্য দেখা গেল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটি ফ্রি কিক থেকে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল। পন্‌সফোর্ড কিক করলেন কিন্তু বল বারের উপর দিয়ে পেছনে গেল। জনতার শ্বাসপ্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হল।"

"এখন কিন্তু মোহনবাগান্ আক্রমণ করছে; এখন নূতন ধরনের উত্তেজনা। শিবদাস ও বিজয়দাস চললেন এগিয়ে। সুন্দরভাবে বল

আদান প্রদানের মাধ্যমে রচনা করলেন চমৎকার সম্মিলিত আক্রমণ। বেন্‌সন এসে বাধা দিলেন শিবদাসকে। বল গেল বিজয়দাসের কাছে এবং চোখের পলকে বিজয়দাস সে' বল ঠেলে দিলেন এ, ঘোষকে। ঘোষ কিন্তু বল মারলেন উপর দিয়ে। তারপর অফসাইড হল জে, রায়। ফ্রি কিক থেকে দক্ষিণ পার্শ্বে চ্যাপমান বল পেলেন। ব্যাক পাশে বল গেল ওল্ডের কাছে। সট করলেন ওল্ড, কিন্তু সোজা হীরালালের হাতে।"

"নিষ্কৃতি পেয়ে মোহনবাগান চাপ সৃষ্টি করে একটি বিফল কর্ণার আদায় করল। তারপর সাপের ছোবল তুলে শিবদাস একক নৈপুণ্যেই এগিয়ে গেলেন। ওল্ড তার উপর পুলিশের মত কড়া নজর রেখেছিলেন। শিবদাস কিন্তু তাকে এড়িয়ে গোলের নিকটবর্তী হলেন। সটও করলেন, কিন্তু অল্পের জন্য গোল হল না। একটু পরই হল আবার বিজয়দাসের সহযোগিতাতে সম্মিলিত আক্রমণ। জনতা ভাদুড়ি ভাইদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু কোন দিকেই গোল নেই। প্রথমার্ধ শেষ হল গোলশূন্য ভাবে।"

বলে চলেছেন ষ্টেট্‌সম্যান, "বিরতির পর খেলার গতি হল ক্ষিপ্রতর। দর্শকদের মাতিয়ে রাখলেন শিবদাস এবং পন্‌সফোর্ড। তখন কিন্তু খেলাতে দেখা গেল উভয় দলেরই রক্ষণ বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব। রাজেন, নীলমাধব, ওল্ড এবং রেন্‌ষ্টেড তখন মহা ব্যস্ত।"

"খেলার বাকী মাত্র দশ মিনিট। তখনও কোন গোল নেই। অল্প পরই কিন্তু মোক্ষম কাজ করল মোহনবাগান। আবার শিবদাস ও বিজয়দাসের কারিগরি এবং এখন বিজয়দাসের সটে নর্টনের পরাজয়।"

গোলটি সম্বন্ধে কিন্তু ইংলিশম্যান বলছেন অন্য কথা।

এ' সংবাদপত্রের মতে, "নর্টন একটি বল ধরে কিক করলেন। বলটি মোহনবাগান দলের একজন খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে প্রতিহত হয়ে

এল বিজয়দাসের পায়ে এবং তিনি সে' বলটিকে কেবল্ল ঠেলে দিলেন গোলে।"

এ' একটি বিষয়ে কিন্তু গণেন মল্লিকের মুখেও ইংলিশম্যানের প্রতিধ্বনি। তিনিও বলেছেন যে গোলটি হয়েছিল নর্টনের দোষে।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (২০. ৭. ১১)-এর কথাতে আছে ষ্টেট্‌সম্যানের সমর্থন। এ' কাগজ লিখেছিলেন, "মোহনবাগানের পুরোভাগের একটি চমকপ্রদ সম্মিলিত আক্রমণ থেকে শিবদাসের মারফৎ বল এল বিজয়দাসের কাছে। বিজয়দাস প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সৈনিক দলের তুই ব্যাক ম্যাডন ও ক্লার্কের মাঝ দিয়ে বিত্যুৎ বেগে এগিয়ে গেলেন। বিপদ বুঝে নর্টনও গোল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু বিজয়দাসের সটে তিনি সম্পূর্ণ প্রতারিত হলেন। হাজার হাজার কণ্ঠের দীর্ঘ চীৎকারে ঘোষিত হল গোল করেছে মোহনবাগান।"

শুধু গোলটি সম্বন্ধে তাদের মতামত নয়, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ পরিবেশিত খেলার বিবরণটিও উল্লেখযোগ্য। এ' সংবাদপত্র বলেছিলেন, "এ' তুটি দলের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের খেলাটিতে খুব দর্শক সমাগম হয়েছিল এবং দর্শকদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ভারতীয়। স্থানীয় সৈনিক দলটি শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।"

"খেলাটির গতি যেমন দ্রুত ছিল, খেলাটিতে প্রতিযোগিতাও হয়েছিল তেমন তীব্র। তুলনামূলক ভাবে আক্রমণে সৈনিক দলের অধিকতর অংশ থাকলেও লক্ষ্যভেদের তুর্বলতার জন্য তারা বহু সহজ সুযোগের অপচয় করেছে।"

"ভারতীয় দলটি এ' দিনও তাদের স্বভাবসিদ্ধ সংঘবদ্ধতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। কিন্তু এ' খেলাতে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল মোহনবাগানের রক্ষণ বিভাগ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় রক্ষণ বিভাগের তৎপরতার জন্যই সৈনিক দল বার বার ব্যর্থ হয়েছে। সৈনিক

দলের বিরুদ্ধে গোলটির জন্য কোন মতেই পরাজিত দলের রক্ষণ বিভাগকে দায়ী করা চলে না।"

"উভয় দলই পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করলেও একমাত্র গোলটি হয়েছে একেবারে খেলার শেষ দিকে। এ' গোলটি করেন বিজয় ভাদুড়ি।"

সাহেবদের লেখা বিবরণ দেয়া হল কিন্তু এখনও বাকী আছে গণেন মল্লিকের বক্তব্য। তার লেখা থেকে জানতে পাই, "ব্যাকে এ' দিন ভূতি সুকুল অপূর্ব খেলেছিলেন। সৈনিক দলের দুর্দান্ত লেফ্‌ট আউট পন্‌সফোর্ডকে তিনি নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। তা' ছাড়া সৈনিক দল উঁচু লম্বা লম্বা পাশ করে খেলেছিল বলে মোহনবাগানের হাফ ব্যাকেরা খুব সুবিধা করতে পারেন নি। ভীষণ চাপ পড়েছিল সুকুল ও সুধীর চ্যাটার্জির উপর।"

তিনিও স্বীকার করেছেন, "রাইফেল ব্রিগেড অনেক বারই সংকটের সৃষ্টি করেছিল কিন্তু গোলের সম্মুখে অক্ষমতার জন্য তারা সাফল্য লাভ করতে পারে নি। সৈনিক দলের পক্ষে ওয়েল্‌স এবং ওয়েলার নজর কাড়ার মত খেলেছিলেন।"

গণেন মল্লিক আরো বলেছেন, "মোহনবাগানের আক্রমণে শিবদাস একাই ছিলেন এক শ'। তাঁর ক্ষিপ্র গতি এবং পায়ের কায়দার কাছে বার বার ব্রিগেড দলের রক্ষণ বিভাগ বিব্রত হয়েছে। তার সঙ্গে চমৎকার সহযোগিতা করেছিলেন বিজয়দাস। ডান পার্শ্বে জে, রায়ের খেলাও এ'দিন চমৎকার হয়েছিল।"

জয়লাভের পর ডালহৌসি মাঠে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা' আজ কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে। বোধ হয় আমাদের কল্পনারও এতখানি দৌড় নেই। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি সকলেই এক বাক্যে বলেছিলেন, "অবর্ণনীয়", "অভূতপূর্ব"।

আরগণেন মল্লিকের আবেগদীপ্ত মন্তব্য ছিল, "ফুটবলের ইতিহাসে লাল কালিতে লেখা দিন।"

মোহনবাগান ঃ এইচ, মুখার্জি ; এ, সুকুল ও এস, চ্যাটার্জি ; এম, মুখার্জি, আর, সেনগুপ্ত ও এন, ভট্টাচার্য ; জে, রায়, এস, সরকার, এ, ঘোষ, বি, ভাদুড়ি ও এস, ভাদুড়ি (অধিনায়ক)।

রাইফেল ব্রিগেড ঃ নর্টন ; ম্যাডক ও ক্লার্ক ; বেন্‌সন, ওল্ড এবং রেন্‌ষ্টেড ; চ্যাপমান, ওয়েল্‌স, বেজফোর্ড, ওয়েলার এবং পন্‌সফোর্ড।

রেফারী ঃ প্রাঃ ম্যাকিন্‌টস।

বিভিন্ন সূত্র থেকে খেলাটির বিশদ বিবরণের মাধ্যমে বর্তমান রসিকেরা নিশ্চয়ই অতীতের সেই দিনটির একটি পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণ চিত্র দেখতে পাবেন। এ' সমস্ত বিবরণের মধ্যে একমাত্র গোলটি ভিন্ন আর কোন বিষয়ে গুরুতর মতভেদ নেই। গোলটি সম্বন্ধে অবশ্য নানা মুনির নানা মত।

সে'দিন ঠিক কি হয়েছিল, তা' আজ একান্তই অনুমান সাপেক্ষ। ষ্টেট্‌সম্যান ও ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ গোলটিকে বিজয়দাসের অনবদ্য অবদান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শেষোক্ত সংবাদপত্র বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে গোলটির জন্য সৈনিক দলের রক্ষণ বিভাগকে কোন মতেই দোষী করা চলে না। ইংলিশম্যানও সমান জোর দিয়ে বলেছেন যে গোলটির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিল গোলরক্ষক নর্টন। গণেন মল্লিকও এ' মতই পোষণ করেছেন।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—মোহনবাগান দলের ব্যাক সুধীর চ্যাটার্জির কথা। শীল্ডজয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই সুধীরবাবু বলতেন যে রাইফেল ব্রিগেড দলের বিরুদ্ধে খেলাতে ভাগ্যদেবী ছিলেন সুপ্রসন্না। এর বেশী তিনি কিছুই খুলে বলতেন না।

খেলাটির বিভিন্ন আলোচনা পাঠের পর একটি বিষয় কিন্তু খুবই স্পষ্ট। খেলাটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল এবং সৈনিক দল গোল করার বহু সুযোগ নষ্ট করেছিল। হয়ত ব্যাকে দাঁড়িয়ে সুধীরবাবু দেখেছিলেন সৈনিক দল কেমন করে সুযোগের অপচয় করে চলেছে।

হয়ত এ'জন্যই তিনি ভাগ্যের উল্লেখ করতেন। তা'ছাড়া এতদিন পর গোলটি ভিন্ন আর কিছুই ভাগ্যের অবদান বলে মনে হয় না।

মোহনবাগানের এ' জয়লাভকে সকলেই বাঙ্গালী ফুটবলের কৃতিত্ব বলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু ইংলিশম্যান এ'কথা মানতে নারাজ। কথায় বলে, "পথের ছেলে রাজা হয়, এ' দুঃখ কি গায়ে সয়।" সয় না, অসহ্যই মনে হয়। তাই বড় গোঁসা হল ইংলিশ ম্যানের। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে, সুতরাং রাগ একটু হতেই পারে।

ঝাল মেটাতে এ' সংবাদপত্র কিছু গাল দিলেন। কে বলে মোহনবাগান বাঙ্গালী দল? কভি নেহি। সামান্য বাঙ্গালী বাবুদের কাছে হারতে পারে একটি সৈনিক দল? তাই মন্তব্য করলেন ইংলিশম্যান (২০. ৭. ১১), "মোহনবাগান প্রকৃতপক্ষে একটি বাছাই করা দল। এ' দলে আছে বাংলার বাইরের খেলোয়াড়।" কটাক্ষ সুকুলের উপর, কিন্তু সুকুলের তখন কলিকাতাতে চার পুরুষের বাস। "আর আছে" বললেন ইংলিশম্যান, "পাশের প্রদেশ পূর্ববাংলার জন কয়েক খেলোয়াড়"। পূর্ববাংলা আর বাংলার অংশ নয়। সুযোগ পেয়ে বঙ্গ-ভঙ্গের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন ইংলিশম্যান।

বাঙ্গালী দলের তৃতীয় পর্যায়ের খেলাতে জয়লাভেই এমন গাত্রদাহ! তখনও জানেন না ইংলিশম্যান যে এই সবে কলির সন্ধ্যা।

এ' সংবাদপত্রের বিসদৃশ মন্তব্যে বোধ হয় সাহেবরাও লজ্জিত অনুভব করেছিলেন। তাই ষ্টেটসম্যান (২৫ ৭. ১১) এর সমুচিত জবাব দিলেন। লিখলেন তারা, "দেশের এখান থেকে, ওখান থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে মোহনবাগান দল গঠিত হয়েছে, এ' কথা সত্য নয়। বর্তমান দলের খেলোয়াড়েরা সকলেই গত কয়েক বৎসর ধরে মোহনবাগানের হয়েই খেলছেন।" ষ্টেটসম্যান আর একটু বলতে পারতেন যে কেবল বিভিন্ন বাগান থেকে বাছাই করে ফুল তুললেই সুন্দর মালা হয় না।

যা' হোক, সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে এখন মোহনবাগান।'

আগতপ্রায় ভবিষ্যতের প্রতি সমস্ত সংবাদপত্রেরই নজর পড়েছে।' রাইফেল ব্রিগেড ১৯১০ সালে শীল্ডের খেলাতে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল। সে' কথার জের টেনে ষ্টেট্‌সম্যান এখন বললেন, "এ' বার পাশার দান উল্টে গেল।" কিন্তু পরের দান কি হতে পারে সে' সম্বন্ধে ষ্টেট্‌সম্যান রইলেন নীরব। তারা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেছিলেন, "তাবৎ শোভতে···যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা (২১. ৭. ১১) কিন্তু জোর কলমে লিখলেন, 'মোহনবাগান যদি এবার শীল্ডের চরম পর্যায়ে উঠে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে তা'হলেও আশ্চর্য হবার কারণ থাকবে না। ক্যালকাটা অবশ্য জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, কিন্তু রয়েল স্কট বনাম ইষ্ট ইয়র্কস্ খেলার বিজয়ী ভিন্ন মোহনবাগানের সমকক্ষ দল আর নেই।'

দূরদৃষ্টি ছিল বটে গণেন মল্লিকের। অন্য সমালোচকেরা যখন মুখে কুলুপ এঁটে বসে বসে নিরীক্ষণ করছেন তখনই তিনি ইষ্ট ইয়র্কস্ দলকে মোহনবাগানের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী বলে চিহ্নিত করলেন।

মোহনবাগানের সেমি-ফাইন্যাল খেলা সম্বন্ধে যেন তার কোন দুশ্চিন্তাই নেই। তার অর্থ এই নয় যে তিনি মিডল্‌সেক্‌স দলের শক্তিকে উপেক্ষা করেছিলেন। উপেক্ষা তিনি করেন নি, বরং বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তেই মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

মিডলসেক্‌স খুবই শক্তিশালী দল। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন গণেন মল্লিক যে গ্রীক পুরাণের স্যাম্‌সনের শক্তি যেমন ছিল চুলে তেমনি এ' সৈনিক দলের শক্তিও কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাদের গোলরক্ষক পিগটের মধ্যে। সমস্ত মাঠে আক্রমণ বিস্তার করে খেলবে মোহন-বাগান, আর মিডল্‌সেক্‌সের নকল বুদি গড় রক্ষা করবেন একা কুম্ভ—পিগট। তাই ফলাফল সম্বন্ধে গণেন মল্লিকের কোন দ্বিধা নেই।

মোহনবাগানের প্রতি অনুরাগের যতই অভাব থাক ইংলিশম্যান ও

এখন শেষের সে' ভয়ঙ্কর দিনটিকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। এ' সংবাদপত্রও মিডল্‌সেক্‌স দলের উপর বিশেষ আস্থা রাখতে পারেন নি। ইংলিশম্যানও (২০. ৭. ১১) বললেন, "প্রতিযোগিতাতে মোহনবাগানের আরো এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে এ' সংবাদপত্র পরিবেশন করলেন আর এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ। লিখলেন এই কাগজ, "এ' খেলার পর মোহনবাগান জোর গলাতেই বলছে যে এ'বার তাদের আই, এফ, এ শীল্ড জয় অবধারিত।"

খোস খবরের ঝুটাও ভাল। কিন্তু কোন সূত্রে ইংলিশম্যান এ' সংবাদ আবিষ্কার করেছিলেন তা' তারা খুলে বলেন নি।

শীল্ড প্রতিযোগিতাতে প্রথম সৈনিক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মোহনবাগানের মনোবল এবং আত্ম-প্রত্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এখনও বাকী সেমি-ফাইন্যাল এবং তারপর ফাইন্যাল। এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার প্রতিযোগিদের আগ বাড়িয়ে অবহেলা করার মত মারাত্মক মনোভাব মোহনবাগানের কখনই হতে পারে না। জোর করেই বলা যেতে পারে যে এমন সদম্ভ উক্তি মোহনবাগানের কোন খেলোয়াড় বা কর্তা ব্যক্তি নিশ্চয়ই করেন নি।

ইংলিশম্যান কি তবে নিজের কথাই মোহনবাগানের মুখে গুজে দিয়েছিলেন?

ঠিক তা' নয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালে জয়লাভের পর থেকেই জনসাধারণের মনে আশার বাতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তারা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। শুধু ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা নয়। স্বপ্ন দেখছিল তারা জেগে এবং মুখ খুলে। তাদের কথাই বোধ হয় ইংলিশম্যানের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল।

ঐ কল-গুঞ্জনে কোন গোপনতা ছিল না। ঐ গুঞ্জন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের কানেও পৌঁছেছিল। এ' সংবাদপত্রও (২৫. ৭. ১১) মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলার পর লিখেছিলেন, "গত কয়েক

দিন ধরেই মোহনবাগান দলের সমর্থকদের মুখে আই, এফ, এ শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা ভিন্ন আর কোন কথা নেই। চমৎকার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের —অবশ্য ভাগ্যের কথা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না—পরিচয় দিয়ে মোহনবাগান সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে। এ' দলের সমর্থকেরা এখন সঙ্গত ভাবেই চরম সাফল্যের স্বপ্ন দেখতে পারে।"

পূর্বোক্ত অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী ছিল জনসাধারণের মনের কথার প্রতিধ্বনি। আগেই বলেছি, রাইফেল ব্রিগেড দলের বিরুদ্ধে খেলাকে ঘিরে ফুটবল প্রেমিকদের মনে ছিল শোধবোধের কামনা। আগের বছর মোহনবাগানের হার হয়েছিল রাইফেল ব্রিগেডের হাতে। তাই জনসাধারণ এবার চেয়েছিল পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ।

তাদের হয়ত ধারণা ছিল যে প্রাক্তন বিজয়ীকে পদানত করতে পারলে মোহনবাগানের রাহুমুক্তি ঘটবে। রাইফেল বিগ্রেড যেন মোহনবাগানের ফাঁড়া। সকলের মনেই বদ্ধমূল ধারণা যে এ' ফাঁড়া কেটে গেলেই মোহনবাগানের ভাগ্যে হবে একাদশ বৃহস্পতি।

জনসাধারণের চোখে রাইফেল ব্রিগেড ছিল যেন ৯৯ এর গাঁট। এ' গাঁট পেরোলে সেঞ্চুরী আটকায় কে? যেমন তেমন সেঞ্চুরী নয়। প্রথম টেষ্ট আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী।

প্রথম শীল্ড ফাইন্যালেই পরম সাফল্য!

* * * *

এমনি পরিস্থিতিতেই এল আই, এফ, এ শীল্ডের সেমি-ফাইন্যাল।

মোহনবাগানের জীবনের সর্বপ্রথম শীল্ড সেমি-ফাইন্যাল। প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি সৈনিক দল; দমদমে অবস্থিত ১ম মিডল্‌সেক্‌স।

খেলা হল ২৪শে জুলাই, ডালহৌসি মাঠে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ খেলার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা মোহনবাগানের নেই। বুক দুরু দুরু এবং স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ। তবু আস্থা এবং আত্ম-

বিশ্বাসের অভাব নেই। মন্দিরের সোপান একটির পর একটি অতিক্রম করে মোহনবাগান এখন বিগ্রহের নিকট এসে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তুত হচ্ছে শেষ প্রণামের জন্য।

ফুটবল রসিকেরা এবং বাংলার জনসাধারণ কিন্তু এখন ভেসে চলেছে এক তীব্র উত্তেজনার বন্যাতে। শীল্ড প্রতিযোগিতার সূচনাতে তারা প্রায় উদাসীনই ছিল। তাদের উত্তেজনা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোহনবাগানের ক্রমশঃ সাফল্যের উত্তাপে উদ্দীপ্ত হয়েছে জনসাধারণ।

তৃতীয় পর্যায়ের খেলাতে শোধবোধের আশা পূর্ণ হওয়া মাত্র তারা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে! হয়ত—হয়ত এবার সুযোগ আসবে ইংরাজদের হারাবার।

অবশ্য নিতান্তই খেলার মাঠে।

কিন্তু তাই বা কম কি? পলাশীর প্রান্তরের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গালীর বুকে কেবল পরাজয়ের গ্লানিই জমেছে। জিতেছি আমরা কবে? না রণক্ষেত্রে, না ক্রীড়াক্ষেত্রে। রণক্ষেত্র এখন কল্পনাতেও বহু দূর। কিন্তু, ক্রীড়াক্ষেত্র? দেখা যাক, ক্রীড়াক্ষেত্রই হয় কি না কুরুক্ষেত্র।

পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার পশ্চাতে সাফল্যের রুপালী রেখা, স্বপ্ন হলেও, এখন যেন নিকটতর মনে হচ্ছে। সাধারণের মনে আশার বাতি এখন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। এতদিনে মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে "বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন" এক হয়ে গিয়েছে। তারা এখন কেবল যুগযুগের সঞ্চিত ব্যর্থতার মেঘের কোলে দেখতে চায় একটুখানি সার্থকতার হাসি।

তাদের আশা, সে' হাসি ফোটাবে মোহনবাগান।

জনতার উৎসাহের বন্যা এখন যেন বিপদসীমা অতিক্রম করতে চলেছে। ২৪শে জুলাই ডালহৌসি মাঠ লোকে লোকারণ্য। সকলে বিস্ময়ে হতবাক।

এখন জনতার দিকে ইংলিশম্যানেরও চোখ পড়েছে। না পড়ে উপায় কি ? এ' যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে। এখন ইংলিশম্যান মোহনবাগানকে আর 'বাবু' বলে উপেক্ষা করতে পারছেন না। তাই অন্তরের সব বিরাগ ও ঘৃণা ঢেলে দিলেন মোহনবাগান দলের সমর্থকদের উপর। কিন্তু তার মধ্যেও যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা' আজ আমাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয়।

কি টানেই যে মোহনবাগান সেদিন বাঙ্গালীকে টেনেছিল !

সকালবেলা থেকেই নাকি লোক আসতে আরম্ভ করেছিল মাঠে। আফিস পালিয়ে নাকি বাবুরা এসেছিলেন মাঠে। সে' যুগের কেরাণীরাও নাকি খেলা দেখার জন্য অফিস ছুটির দাবী জানিয়েছিলেন। এমন অমৃতসমান কাহিনী ইংলিশম্যানের জবানীতে বলাই বোধ হয় সঙ্গত।

"নেটিভের দল" বলেছিলেন ইংলিশম্যান, (২৫. ৭. ১১.) "সকাল-বেলা থেকেই ডালহৌসি মাঠে ভীড় করতে আরম্ভ করেছিল। ভাল করে খেলা দেখা যাবে এমন সব জায়গা সাড়ে তিনটাতেই জবর দখল হয়ে গেল। (অর্থাৎ, নেটিভদের সঙ্গে গা না লাগিয়ে আলগোছে খেলা দেখার উপায় সাহেব-সুবোদের আর রইল না।) চারটার সময় মাঠের চারদিকে কাতারে কাতারে লোক। আর সাড়ে চারটাতে গ্যালারি ভিন্ন আর কোনখানে এতটুকু ফাঁকও নেই। মাঠের চারদিকে রাজপথের উপর সার বাঁধা গাড়ী ; তার উপর মানুষ। তবু লোক আসার বিরাম নেই।"

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই !

"ভাবতে অবাক লাগে", বলে চলেছেন ইংলিশম্যান—আর পঁয়ষট্টি বছর পরে আজ আমাদেরও ভাবতে অবাক লাগে—"দিনের আগ বেলাতেই কলিকাতার এত লোক মাঠে এল কি করে ?" খোঁজ নিয়ে জানালেন এই সংবাদপত্র, "স্থানীয় অফিসগুলির অধিকাংশ করণিক

সেদিন অফিসে না গিয়ে এসেছিল মাঠে। যারা অফিসে গিয়েছিলেন তারাও আগে আগে ছুটির জন্য সোচ্চার দাবী জানিয়েছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মনে পড়ছে। শিশু বলছে, “বাবা কেন যায় অফিসে, যায় না নূতন দেশে?” আজ দেখতে পাচ্ছি বাঙ্গালী বাবা একদিন অন্ততঃ অফিস না গিয়ে খেলার মাঠে মোহনবাগানকে মদত দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, আমাদের জানতে ইচ্ছা করে অফিসে সেদিন অনুপস্থিতির জন্য তারা কি কারণ দেখিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে বহু প্রচলিত একটি কৌতুকের গল্প আছে। অফিসের ছোকরা পিয়ন বড় সাহেবের নিকট এক দিনের ছুটি চাইছে। সাহেব কারণ জানতে চাইলে ছোকরা করুণ মুখে জানাল যে সে' দিন তার ঠাকুরমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হবে। খুব গম্ভীর মুখ করে বড় সাহেব বললেন, “ওহে ছোকরা, ঠাকুরমা দিদিমা ইত্যাদির মৃত্যুগুলি এফ, এ কাপ ফাইন্যালের জন্য শিকেয় তুলে রাখ।”

আমি ভাবছি, সেমি-ফাইন্যাল খেলাতেই এমন গণছুটি। না জানি ফাইন্যালের দিন কি হয়েছিল? তবে ফাইন্যাল খেলা ছিল শনিবার।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। ইংলিশম্যান আরো বলছেন, “বাক্স, টুল ও টেবিলের মালিকেরা এ' দিন ফলাও ব্যবসা করেছিল। পাঁচটার সময় মাঠে জন-সমুদ্র। এরি মধ্যে এদিক ওদিক কোনরকমে জায়গা করে নিয়েছেন কিছু কিছু মেমসাহেব।”

“গাছে উঠেছিল অসংখ্য লোক। মানুষের ভারে ডালহৌসি তাঁবুর পেছনের একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে গেল। নীচে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাই জখম হল বেশী। হঠাৎ মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেখা গেল খণ্ডযুদ্ধের সূচনা।” ছাতা, লাঠি উঁচিয়ে চীৎকার করে সবাই বলছে, “বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী”। অর্থাৎ এখানে আর কারো

দাঁড়াবার স্থান হবে না। "পুলিশ এবং রাইফেল ব্রিগেডের সৈনিকেরা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হিমসিম খেয়ে গেল।"

ষ্টেট্সম্যান এবং ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজেরও একই সুর, একই বক্তব্য। শেষোক্ত কাগজ (২৫. ৭. ১১) কেবল বাড়তি যোগ করলেন, "দূর-দূরান্তর থেকে এমন বহু লোক এসেছিল যারা আগে কখনও ফুটবল খেলা দেখে নি। চাঁদের বুড়ী এবং ফুটবল তাদের কাছে একই ধরনের গল্প।"

তবু তারা এসেছিল কেবল সাহেবদের হার দেখার জন্য।

শীল্ড প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যাল, প্রাক্-শেষ পর্যায়। সবজান্তা সমালোচকদের প্রারম্ভিক মতামত কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। ইংলিশম্যান (৪. ৭. ১১) বাহাদুরি ফলিয়ে বলেছিলেন, "রয়েল স্কট দলেরই শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী···স্থানীয় দলগুলিকে শীল্ড কলিকাতাতে রাখতে খুবই বেগ পেতে হবে। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে আই, এফ, এ শীল্ড এবার বাইরেই যাবে।"

শীল্ডের বাইরে যাবার সম্ভাবনা অবশ্য এখনও লুপ্ত হয় নি। ইষ্ট ইয়র্কস সেমি-ফাইন্যালে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু কোথায় গেল সম্ভাব্য বিজয়ী বলে চিহ্নিত রয়েল স্কট দল? প্রথম খেলাতেই হেরে ভূত এবং অনেক কেলেঙ্কারী করে।

ইষ্ট ইয়র্কস দলের বিরুদ্ধে ছিল তাদের প্রথম পর্যায়ের প্রথম খেলা। পয়লা দিন খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল এবং দ্বিতীয় দিনে রয়েল স্কট হেরে গেল। কিন্তু তারা রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল এবং আই, এফ, এ সে' প্রতিবাদ মঞ্জুর করলেন।

শোনা গেল, আই, এফ, এর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইষ্ট ইয়র্কস প্রতিযোগিতা থেকে তাদের নাম তুলে নেবে। পর্দার অন্তরালে এ' নিয়ে অনেক জল ঘোলা হল। শেষ পর্যন্ত ইষ্ট ইয়র্কস আবার খেলতে রাজী হল এবং এবারেও রয়েল স্কটকে হারাল।

বিদায় নিল ইংলিশম্যান কর্তৃক সম্ভাব্য বিজয়ী বলে চিহ্নিত দল।

স্থানীয় দলগুলিকে শীল্ড কলিকাতাতে রাখতে বেগ পেতে হবে বলেও অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ইংলিশম্যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইন্যালে দেখা গেল স্থানীয় দলেরই প্রাধান্য ; চারটির মধ্যে তিনটিই স্থানীয় দল। সেমি-ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বী হল ক্যালকাটা বনাম ইষ্ট ইয়র্কস এবং ১ম মিডল্‌সেক্‌স বনাম মোহনবাগান। মিডল্‌সেক্‌স দলের অবস্থান ছিল দমদমে।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের (৮. ৭. ১১) অনুমানও ঠিক হল না। তারা বলেছিলেন যে সৈনিক দলেরই শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা বেশী। এখনও সকলেই ভাবছে যে শীল্ড জিতবে হয় মিডল্‌সেক্‌স, নয় ইষ্ট ইয়র্কস। স্থানীয় দলের মধ্যে ক্যালকাটাকে সমর্থন করাই তারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন। ক্যালকাটাও সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে। মোহনবাগানও সেমি-ফাইন্যালে পৌঁচেছে। কিন্তু মোহনবাগান যেন অনাহূত। এ' পর্যায়ে তাদের অভাবনীয় উপস্থিতি যেন অবাঞ্ছিত ; অপ্রত্যাশিত ত' নিশ্চয়ই।

সকলেরই নজর মিডল্‌সেক্‌সের উপর। শক্তিমান দল এবং তাদের অধিনায়ক হলেন অসামান্য কৃতী গোলরক্ষক পিগট। ইষ্ট ইয়র্কস দলের গোলরক্ষক ক্রেসিরও খুব নামডাক ছিল। কিন্তু ক্রেসির চেয়েও পিগট ছিলেন মাথায় অনেক লম্বা। তাই সকলেই পিগটকে গোলরক্ষক কুলের শিরোমণি বলে মনে করতেন।

খাস ইংলণ্ডেও ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা ছিল পিগটের। সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতে আসার পূর্বে তিনি বিলাতের পোর্টস-মাউথ দলের গোলরক্ষক ছিলেন। ভারতীয় ফুটবলেও অচিরেই তিনি তারকার দীপ্তিতে প্রতিভাত হলেন। বর্তমান মরসুমেও পিগট চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে একটি অসামান্য রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। তিনি এ' বৎসর নয়টি পেনালটি বাঁচিয়েছিলেন।

নয়টি পেনালটি রক্ষা সোজা কথা নয়। এ' কীর্তি নিঃসংশয়ে পিগটের অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু পিগটের কৃতিত্বের বাইরে এ' প্রসঙ্গে অন্য একটি প্রশ্ন মনে জাগে। যে দলের বিরুদ্ধে একই মরসুমে বিভিন্ন রেফারীকে নয়টি পেনালটির সিদ্ধান্ত দিতে হয় তারা নিশ্চয়ই পরিচ্ছন্ন খেলাতে বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয়ই দৈহিক শক্তির অপ-প্রয়োগের প্রবণতা তাদের আছে।

সত্যই মিডল্‌সেক্‌সের মারকুটে দল বলে বদনাম ছিল। ঐ দুর্নাম মোহনবাগানের অজানা ছিল না এবং দলের অধিনায়ক শিবদাস এ' বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন্।

মোহনবাগানের খেলোয়াড় সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। বলতে গেলে এগারো জনের বেশী খেলোয়াড়ই তাদের নেই। একজনের চোট লাগলে দলই খোঁড়া হয়ে যাবে। এ' সমস্যার কথা বিবেচনা করে শিবদাস খেলার একটি কৌশল উদ্ভাবন করলেন।

তিনি মনে করলেন যে, এ' দলের বিরুদ্ধে একটানা আক্রমণ করে খেলা সঙ্গত হবে না। স্থির করলেন যে, যথাসম্ভব—বল অনাবশ্যক আদান প্রদান করে হলেও—খেলা মাঝ মাঠেই আটকে রাখতে হবে। আক্রমণ করতে হবে অতর্কিতে এবং তারপরই পিছিয়ে আসতে হবে। তা'হলেই মিডল্‌সেক্‌স গায়ের জোর খাটাবার তেমন সুযোগ পাবে না। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য; বুদ্ধির প্যাঁচেই শিবদাস মিডল্‌সেক্‌স দলকে প্রতিহত করেছিলেন।

তবু সৈনিক দল ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটি গোল করেছিল।

খেলার দিন মোহনবাগান সমর্থকদের দুর্ভাবনার সীমা নেই। সারা দিন থেকে থেকে বৃষ্টি হয়েছিল। খেলার মাঝেও বৃষ্টি ছিল। মাঠে কিছু জল জমল, নরম হল মাঠ। এমন মাঠে মোহনবাগানের অসুবিধা হবারই কথা। কিন্তু খেলা শুরু হতে না হতেই কেটে গেল

উৎকণ্ঠা। দেখা গেল স্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতি এবং সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়েই খেলছে মোহনবাগান।

আগে মাঠে নামল মিডল্‌সেক্‌স ; মৃদু হাততালির অভ্যর্থনা পেল। টসে জিতে রেড রোডের দিকের গোল রক্ষা করতে লাগল। মোহনবাগানের মাঠে অবতরণ ঘোষিত হল এক বিশাল গর্জনে। কিন্তু পূব দিকের গোলে হীরালালের চোখে পড়ছে সূর্যের আলো। হাত তুলে বার বার চোখ আড়াল করছেন হীরালাল।

৫০ মিনিটের খেলা এ' দিন শেষ হয়েছিল অমীমাংসিত ভাবে, ১-১ গোলে। অতিরিক্ত সময় খেলা হয় নি।

উভয় দলের খেলার তুলনামূলক বিচার করে দিনের খেলা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (২৫·৭·১১) বলেছিলেন, "উভয় দলের আক্রমণ এবং পালটা আক্রমণের বিচারে এ' কথা স্বীকার করতেই হবে যে খেলাতে সিংহভাগ ছিল সৈনিক দলের। তবু গতিবেগ, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং ব্যক্তিগত চাতুর্যে উজ্জ্বল ছিল মোহনবাগানের খেলা। নরম মাঠের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সৈনিক দল আগাগোড়া তীব্র আক্রমণ চালিয়েছে।"

আক্রমণে সৈনিক দলের সিংহভাগ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু কি দানবীয় আচরণে যে সৈনিক দল এ' সিংহভাগ কুক্ষিগত করেছিল সে সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের কোন বক্তব্য নেই। অন্যান্য সংবাদপত্রও ঐ প্রসঙ্গে কিছু বলেন নি।

কিন্তু মোহনবাগানের প্লাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থে একটি ছোট মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "খেলাতে যারা পরিচ্ছন্নতা এবং সৌষ্ঠবের অনুরাগী তারা ঐ খেলা দেখে খুশী হতে পারেন নি। খেলাটিতে প্রায় সকল সময়েই দৈহিক শক্তির অপ-প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল এবং কোন কোন সময়ে তা' চরমে উঠেছিল।"

এ' কথা যে কেমন সত্য তার প্রমাণ পাঠকেরা অন্যান্য সংবাদপত্রের বিবরণ থেকেও পরে পাবেন। এখন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের সমালোচনার কথাই বলি।

"মোহনবাগান দৃঢ়তা ও দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করেছে," বললেন এই সংবাদপত্র, "এবং আক্রমণ করেছে সুযোগ বুঝে। কিন্তু যখনই মোহনবাগান আক্রমণ করেছে তখনই তারা শত্রুর ব্যূহের গভীরে প্রবেশ করেছে। অধিকতর আক্রমণ করেও মিডল্‌সেক্‌স কিছু গভীরতর সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে নি।"

বোঝা যাচ্ছে যে শিবদাসের অবলম্বিত কৌশল খুবই কার্যকরী হয়েছিল, কিন্তু শিবদাসের সেই কৌশল তদানীন্তন সমালোচকদের নজরে পড়ে নি।

উপসংহারে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখলেন, "লক্ষ্যভেদে সৈনিক দল মোটেই তৎপরতা দেখাতে পারে নি। তার উপর মুখার্জিও এ' দিন গোলে চমৎকার খেলেছিলেন। তুলনামূলক ভাবে মোহনবাগানের আক্রমণ সংখ্যাতে কম হলেও গোলরক্ষক পিগট এমন তৎপর না হলে ভারতীয় দলটিই হয়ত আবার গোল করে বিজয়ী হত।"

"তবে খেলার মত খেলা খেলেছেন এদিন তরুণ ভূতি সুকুল। অন্তঃত তিন বার সুকুল তার দলকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সুকুলকে প্রশংসনীয় ভাবে সাহায্য করেছেন সেনগুপ্ত ও চ্যাটার্জি। মোহনবাগানের আক্রমণে এদিন ভাদুড়ি ভ্রাতৃদ্বয়, সরকার ও রায় সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন।"

ইংলিশম্যানের (২৫.৭.১১) মতে মিডল্‌সেক্‌স দলের সেণ্টার হাফ উটেন এবং ব্যাক ইডেন ছিলেন মাঠের সেরা খেলোয়াড়। এ' দুই মহাবীর নাকি সেদিন মোহনবাগানের অগ্রগতির পথ রোধ করেছিলেন।

খেলার ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গিয়ে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ

প্রথমেই বললেন, "সোমবার ডালহৌসি মাঠে মোহনবাগান এবং দমদমের ১ম মিডল্‌সেক্‌স দলের মধ্যে সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি দেখতে কলিকাতার ফুটবল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জন-সমাবেশ হয়েছিল। পঞ্চাশ মিনিটের প্রতিযোগিতার পর সমান সম্মান নিয়ে দল দুটি মাঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।"

"মোহনবাগানের সমর্থকবৃন্দ এ' দিন বুকভরা আশা নিয়ে মাঠে এসেছিল। গত কয়েকদিন ধরেই তাদের মুখে মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা ভিন্ন আর কোন কথাই নেই। প্রসন্ন ভাগ্য এবং চমকপ্রদ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের সাহায্যে মোহনবাগান সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে। সুতরাং জনসাধারণ আশাবাদী হতেই পারে।"

তারপর পিঠ চাপড়ে একটু প্রশস্তি গেয়ে বললেন, "মিঃ বোসের দলের গৌরব খর্ব করবার কোন বাসনা আমাদের নেই। মোহনবাগানের এ' প্রকার সাফল্যে ভারতীয় ফুটবলের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মোহনবাগানের জয়লাভ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে সুযোগ সুবিধা পেলে বাঙ্গালী দল ভারতের সামরিক বা বে-সামরিক যে কোন দলের বিরুদ্ধে সসম্মান প্রতিযোগিতা করতে পারে।"

"ভারতীয় দর্শকেরা স্বাভাবিক ভাবেই মোহনবাগানকে সমথন জানিয়েছিল," বললেন এই সংবাদপত্র। "কিন্তু বহু য়ুরোপীয় দর্শকও এ' দিন মোহনবাগানের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। ভারতীয় দলের ক্ষিপ্র গতি, অপূর্ব পায়ের কায়দা এবং পরিচ্ছন্ন খেলা দেখে সাহেবরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন যে এ' খেলার কথা বহুদিন তাদের মনে থাকবে।"

"খেলাটিতে অলস এবং নীরস মুহূর্ত ছিল না বললেই হয়। ভাল খেলার তারিফ দর্শকেরা করবেই, কিন্তু মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে অধিকতর ভাবপ্রবণ অংশের বলগাহীন উত্তেজনা প্রশমিত করতে

পুলিশকে এ' দিন সব সময়েই সজাগ থাকতে হয়েছে। মোহনবাগান দলের যে কোন খেলোয়াড় দর্শনীয় কিছু করলেই ছাতা ও চাদর উড়িয়ে তারা বেসামাল হয়ে উঠেছিল। পরিশোধমূলক গোলটি হলে যে কর্ণ-বিদারী চীৎকার উঠেছিল তার কথা মনে হলেই হৃৎকম্প হয়। এমন পরিস্থিতিতে মাঠের মধ্যে রেফারীর জন্য করুণাই হয়।"

এ' দিন ক্রীড়া পরিচালনা কেমন অক্ষম ও ত্রুটিপূর্ণ হয়েছিল তা' প্রকাশ পাবে পরে। কিন্তু আগ বাড়িয়েই ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ সাফাই গেয়ে রাখলেন। পরেও অবশ্য তারা দর্শকদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন।

খেলার গতি এবং উত্থান পতনের কথা বলতে গিয়ে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখলেন, "৫-৩৩ মিনিটে খেলার সূচনা করলেন এ, ঘোষ। টসে হেরেছিল মোহনবাগান। ভারতীয় দল আক্রমণ রচনা করার পূর্বেই উটেন সেই বল কেড়ে নিলেন এবং উঁচু সটে বল দিলেন ষ্টেইন্‌সকে। তিনি দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে গেলে সেনগুপ্ত তাকে বাধা দিলেন। ষ্টেইন্‌স তাড়াতাড়ি গোলে সট করলেন কিন্তু বল গেল বাইরে। অতঃপর কিছুক্ষণ খেলা হল মাঝ মাঠে। তারপর মিডল্‌সেক্‌স দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড গোল করার একটি সুযোগ পেলেন। তীব্র জোরে গোলে সটও করলেন তিনি। চ্যাটার্জি তখন হেড করে কর্ণার না করলে সেই সটেই মোহনবাগান দলের পতন ঘটতে পারত।"

"প্রথম ধাক্কা সামলে মোহনবাগান এখন করল পালটা আক্রমণ। সৈনিক দল বাধ্য হল নিজ এলাকাতে পশ্চাদপসরণে। সেনগুপ্ত হেড করে একটি বল দিলেন রায়কে। কানু লাইন ছেড়ে ভেতরে এসে বলটি ধরলেন এবং হাফ-ব্যাককে ফাঁকি দিয়ে নিমেষে প্রতিপক্ষের গোলের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ইডেন বাধা দিলেন তাকে এবং লম্বা সটে বলটি ফিরিয়ে দিলেন। এ' সময়ে কয়েক মিনিটের জন্য

খেলাতে মোহনবাগান দলের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। বিজয়দাস এবং সরকার দু' বার গোল করার চেষ্টা করলে পিগট তা' সাবলীল ভাবে রক্ষা করলেন। কিছু পরেই সৈনিক দলের গোল সীমানার অল্প দূরে ভারতীয় দল ফাউলের জন্য একটি ফ্রি কিক পেল। সুকুলের সট উটেন হেড করে ফেরালেন।"

এতক্ষণে একটি মাত্র ফ্রি পেল মোহনবাগান। কিন্তু এ' সময়ের মধ্যে মিডল্‌সেক্‌স দল যে কতবার ফাউল ও হাণ্ডবল করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। সংবাদপত্রে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু বহু প্রত্যক্ষদর্শীই এ' কথা বলেছেন।

রেফারীর ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা কিংবা অক্ষমতাতে দর্শকেরা ইতিমধ্যেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বিস্ফোরণ ঘটল একটু পরে।

"ইতিমধ্যে শিবদাস একবার ভেলকি দেখালেন। বিজয়দাসের কাছ থেকে বল পেয়ে পরপর তিন জনকে কাটিয়ে সর্পিল গতিতে এগিয়ে গেলেন মোহনবাগানের অধিনায়ক। কিন্তু নরম মাঠে গতিবেগ উপযুক্তভাবে সংযত করতে পারলেন না। ফলে শিবদাসের সট নেবার কোণটি হয়ে গেল সঙ্কীর্ণ। পিগট গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে বিপদমুক্ত করলেন।"

"সৈনিক দল তারপর আবার আক্রমণে ফিরে এল। এবার তারা প্রচণ্ড চাপ দিল মোহনবাগানের উপর। অল্প সময়ের মধ্যেই এটকক, বেভিন ও ক্লার্ক উপর্যুপরি গোলে তিনটি সট করলেন। দম ফেলবার সময় নেই মোহনবাগানের গোলরক্ষকের। হীরালাল কিন্তু কৃতিত্বের সঙ্গে দুটি সট বাঁচালেন। কিন্তু তৃতীয় সটটি ধরতে গিয়ে হীরালালের হল পদস্খলন এবং সেই ছিদ্রপথে ঘটল মোহনবাগানের পতন।"

হীরালাল ক্ষীণকায় হলেও সাহসে ছিলেন দুর্জয়। পা পিছলে গেল তার; বলটিও হাত থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন হীরালাল। বল তিনি ছাড়লেন না।

সৈনিক দলও তাকে ছাড়ল না। গায়ের জোরে ঠেলেই বল ও গোল-রক্ষককে তারা লাইন পার করে দিলেন।

গোল হল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে।

সে' সময়ে মোহনবাগান ছিল ইংলিশম্যান কাগজের চক্ষুশূল। সে' ইংলিশম্যানও (২৫.৭.১১) গোলটি সম্বন্ধে লিখলেন, "বিরতির পাঁচ মিনিট আগে সৈনিক দল এগিয়ে গেল। একটি বল ধরতে গিয়ে মোহনবাগানের গোলরক্ষক জল বাতাসের ধাক্কাতে ভারসাম্য হারালেন। কিন্তু বল তিনি ছাড়লেন না। সুযোগ দেখে সৈনিক দল মরণপণ চেষ্টা করে গায়ের জোরে ঠেলেই বলশুদ্ধ গোলরক্ষককে নিয়ে গেলেন লাইনের ওপারে। সৈনিক দলের গোল হল।"

ইংলিশম্যান বললেন কিছু, কিন্তু না-বলা রাখলেন অনেক কিছু।

এ' কাগজের না-বলা কথা প্রকাশ পেল ষ্টেট্সম্যানের (২৫.৭.১১) সমালোচনাতে। লিখলেন ষ্টেট্সম্যান, "হীরালাল বল নিয়ে গোল লাইনের উপর মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। তাকে নিয়ে তখন উত্তেজিত ভাবে ঠেলাঠেলি করছে সৈনিক দলের আক্রমণ বিভাগের খেলোয়াড়েরা। এ' পরিস্থিতিতে রেফারী গিয়ে শলা পরামর্শ করলেন লাইন্সম্যানের সঙ্গে। তিনি বললেন গোল হয়েছে। রেফারী দিলেন গোল। লাইন্সম্যান ছিলেন ক্লেটন।"

কিছু ফাঁস করে দেয়া সত্ত্বেও ষ্টেট্সম্যানের বক্তব্যেও কারচুপি ছিল অনেক। সৈনিক দল যে হই হল্লা করে গোলের দাবী জানিয়েছিল এ' কথা বলতে বোধ হয় ইংলিশম্যান এবং ষ্টেট্সম্যানের লজ্জা হয়েছিল। কিন্তু তাও প্রকাশ পেল ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের (২৫.৭.১১) লেখাতে।

এ' সংবাদপত্র যে আগেই রেফারীর সাফাই গেয়েছিল সে' কথা পূর্বেই বলেছি। তবু তারা লিখলেন, "মোহনবাগান গোলের সম্মুখে তখন মুখার্জিকে কেন্দ্র করে রাগবি খেলা চলছে অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর সৈনিক দল গোলের জন্য সোচ্চার দাবী করল। লাইন্‌সম্যান ক্লেটনকে জিজ্ঞাসা করে রেফারী তাদের সে' দাবী মেটালেন।"

মোহনবাগান নীরবে মেনে নিল এই নির্দেশ—কথাটি না বলে, কোন আক্ষেপ বা বিক্ষোভ প্রকাশ না করে।

কিন্তু উপস্থিত জনতা ক্ষুব্ধ হল, উত্তেজিত হল।

এ' সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখলেন, "রেফারী যখন গোল দিয়েছেন তখন এ' সম্বন্ধে বলবার আর কিছুই নেই।" অর্থাৎ, তারা রেফারীর কোন সমালোচনা করতে নারাজ। "মোহনবাগান দল কিন্তু চমৎকার খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে শান্ত ভাবেই এ' দণ্ডাজ্ঞা মেনে নিল।"

এই বলেই তারা আবার খেলার কথাতে ফিরে এলেন। বললেন, "সাময়িক বিরতির তখন পাঁচ মিনিট বাকী। বিজয়দাস এ' সময়ে একটি বল ধরে রায় এবং সরকারের সহযোগিতায় মিডল্‌সেক্‌স দলের রক্ষণ বিভাগকে ছত্রভঙ্গ করে উপস্থিত হলেন গোলের সম্মুখে। সুন্দর সটও করলেন গোলে কিন্তু পিগট কৃতিত্বের সঙ্গে সে' বিপদ কাটিয়ে দিলেন।"

এক গোলে পিছিয়ে মোহনবাগান করল দিক পরিবর্তন।

বিরতির সময় কিন্তু মাঠের চেহারাই বদলে গেল। আবহাওয়া হল উত্তপ্ত; উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

১৯১১ সালের জনতার ফুটবল আইন সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ত নিতান্তই সীমিত ছিল। তাদের এ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে ধরে নিলেও আপত্তি করব না। সাহেবি সংবাদপত্রগুলিও আগেই বলেছেন যে ফুটবল তাদের নিকট চাঁদের বুড়ীর মত অজানা এবং অচেনা।

তারা হয়ত জানত না যে সে' সময়ের ফুটবলের আইন অনুসারে গোলরক্ষকের দখলে বল থাকলে তাকে 'চার্জ' করা বিধিসম্মত বলেই বিবেচিত হত। কিন্তু সমালোচকেরা নিশ্চয়ই জানতেন যে সে'

অবস্থাতেও গোলরক্ষককে কেবল কাঁধ দিয়ে ধাক্কা (shoulder charge) দেয়াই চলত ; অন্য কিছু করা যেত না। তবু তারা রেফারীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না।

জনতা অজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু তারা কোন সময়েই অন্ধ নয়। চোখে স্পষ্ট যা' দেখছে সহজ বুদ্ধিতে তার সহজ অর্থ করতে সকল সময়েই তারা সক্ষম। তারা ফুটবলই ভাল করে জানে না, সুতরাং ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের "মোহনবাগানের গোলের সামনে গোলরক্ষককে নিয়ে রাগবি" খেলার অর্থ তাদের বুদ্ধির বাইরে। তারা চোখ বিস্ফারিত করে দেখল যে সেখানে চলেছে প্রচণ্ড ধাক্কা-ধাক্কি—"হেই···ও" "হেই···ও" বলে ধাক্কা—হীরালালকে নিয়ে কুস্তি।

আর, তারা দেখল যে রেফারী কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বটে! "নিজের বেলা পরিপাটি, আমার বেলা দাঁত-কপাটি"—এমন সুয়ো দুয়ো আচরণ অন্ধেরও চোখ পড়ে। জনতার আর সহ্য হল না। প্রতিবাদে মুখর হল তারা।

কি দোষ জনসাধারণের? কত সহ্য করবে তারা নীরবে? তারা দেখেছে এবং শুনেছে ইতিপূর্বে রেঞ্জার্সের সঙ্গে খেলাতে কেমন করে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনালটি দেয়া হয়েছিল। তখন গণেন মল্লিক লিখেছিলেন, "এ' সময়ে ঘটল এক বিপত্তি। সুকুলের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মোহনবাগানের ঘনিয়ে এল মহা বিপদ। রেঞ্জার্স দলের একটি আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে জলসিক্ত মাঠে সুকুলের পা পিছলে গেল। টাল সামলাতে তিনি রেঞ্জার্স দলের একজন খেলোয়াড়ের গলা জড়িয়ে ধরলেন। বাজল বাঁশি, হল ফাউল। সে' ফাউল হল নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে ; সুতরাং পেনালটি।"

জনতা অতশত বোঝে না। তারা দেখেছিল সুকুল পড়ে যেতে যেতে নিকটতম লোকের গায়ে হাত রেখে ভারসাম্য সামলিয়েছেন। রেঞ্জার্সের সে' খেলোয়াড়ের পায়ে বলও ছিল না। তাতেই তখন

ফাউল এবং তাতেই পেনালটি। আর এখন? চারজন লালমুখো গোরা একলা হীরালালের সঙ্গে কুস্তি করছে। একেবারে নিকষিত হেম! ফাউল গন্ধ নাহি তাহে।

উলটে আছে, চেয়ে পাওয়া গোল।

জনতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। নেটিভ জনতা—তাদের মধ্যে কিছু শহুরে লোক থাকলেও বেশীর ভাগই গোবেচারা বঙ্গ-সন্তান। সাহেব-সুবোদের সহবতের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তারা কেবল চোখ মেলে দেখল এবং বুঝল যে রেফারী তাদের সাধের স্বপ্নে বাগড়া দিতে চাইছে। সহজ বুদ্ধিতে তারা বুঝল যে সাহেবরা হেরেও হার মানতে চায় না; না জিতেও চায় জিততে।

সব বাঁধ ভেঙ্গে গেল তাদের। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল চোখা চোখা গ্রাম্য বুলি। কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হস্তে আস্ফালন করল; কেউ কেউ উঁচু করে তুলল ছাতা আর লাঠি। আবার কেউ কেউ রেফারী এবং লাইন্‌সম্যানের নিকট আত্মীয়াদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে কিছু কাঁচা খিস্তি করে গায়ের ঝাল মেটাল।

বাক্যবাণ বেশ ঝাঁকে ঝাঁকেই বর্ষিত হয়েছিল; বেশ তীক্ষ্ণও ছিল। না-জানা বুলি, তবু আঁতে লেগেছিল।

রেফারী সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের কোন কথাই ছিল না। দর্শকদের সম্বন্ধে কিন্তু কথার খৈ ফুটল।

কথামৃত বর্ষণ হল। ভারিক্কি চালে লিখলেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (২৫. ৭. ১১), “ভারতীয় দলের বহু দায়িত্বজ্ঞানহীন সমর্থক রেফারী এবং লাইন্‌সম্যানের উদ্দেশ্যে যে ভাষা প্রয়োগ করেছিল তাকে কিছুতেই ভদ্রজনোচিত বলা যায় না। তাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ মোহনবাগান ক্লাবের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অশালীন ভাবে গলা ফাটিয়ে চীৎকার এবং বিদ্রূপ করেছিল।”

"এমন নিন্দনীয় আচরণের জন্য আমরা বিশেষভাবে কাউকে দায়ী করতে চাই না। কিন্তু শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলকে আমরা খেলার মাঠে অনাবশ্যক উত্তেজনা সংযত করতে অনুরোধ করব। আশা করি, আমাদের এ' অনুরোধ বিফল হবে না। তাদের আবারও আমরা বলছি—খেলার মাঠে যা' ঘটে তা' তখন কেবল দেখে যান; তারপর রকে (এ' সংবাদপত্র অবশ্য খাবার টেবিলের উল্লেখ করেছিল) বসে আশ মিটিয়ে সমালোচনা করুন।"

কি অন্যায়! কি ঘেন্না! এমন করে কি বুকে দাগা দিতে আছে?

কিন্তু ১৯১১ সালের সেই জনতা আর কি করতে পারত? নিতান্তই নিরক্ষর, নেটিভ তারা। রেখে ঢেকে, সাধু ভাষাতে অসাধু কথা বলার কায়দা কানুন তাদের জানা নেই। মনে যা এসেছে, মুখে তাই বলেছে। রেফারী অন্যায় করেছে; তারা সে অন্যায়ের প্রতিবাদ মাত্র করেছে।

অবশ্য, সভ্যভাবে এবং সাধু ভাষাতেও কিছু প্রতিবাদ হয়েছিল। এই ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজেই এমনি একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তার সম্পূর্ণ বয়ান তুলে দিচ্ছি নীচে।

"কিছু দর্শক—তারা 'স্পোর্টস্‌ম্যান' ছদ্ম-নামের আড়ালে নিজেদের গোপন রাখতে চান—কাল গভীর রাত্রে আমাদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছেন।" লিখেছেন তারা, "আজ সন্ধ্যাতে আপনি নিজে ডালহৌসি মাঠে উপস্থিত ছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। ইচ্ছাকৃত ফাউলের অপরাধে খেলোয়াড়দের প্রথমে সতর্ক করে পরে মাঠ থেকে বহিষ্কার করা সম্বন্ধে ফুটবলের একটি আইন আছে বলেই আমরা জানি। কিন্তু, কাল সে' নিয়মের কি হল তাই ভেবে আমরা অবাক হচ্ছি।"

"রেফারীর লক্ষ কোটি চোখ হতে পারে না, তা আমরা জানি এবং বুঝি। কিন্তু রেফারী মাত্রেরই দুটি সাদা চোখে খেলাতে নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে কিনা তা' দেখার ক্ষমতা থাকা উচিত। আমরা সব সময়েই জেনে

এসেছি যে ফুটবল পায়ের খেলা, হাতের নয়। হাতে লাগলে হ্যাণ্ডবল হয়, ধাক্কাধাক্কি করলে হয় ফাউল। কিন্তু কাল মিডল্‌সেক্‌স দল অনবরত ফাউল করেছে—ইচ্ছা করেই ফাউল করেছে—হাসতে হাসতে খেলার সব আইনই ভেঙ্গেছে। তবু তাদের একজনকেও মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয় নি।"

"খেলাতে এ সমস্ত কি চলতে দেওয়া উচিত? সাদা কালো কোন দল জিতবে এ' নিয়ে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। খেলা—খেলাই।"

কিন্তু, "এ' ত খেলা নয়, এ' যে হৃদয় দহন জ্বালা।"

সত্যই এ' সামান্য খেলা নয়। মোহনবাগান জিতলে একটি বাঙ্গালী দল উঠবে আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইন্যালে। ইঙ্গ সমাজের বুকে জ্বলবে রাবণের চিতা; মুখে শোনা যাবে প্রলাপ, "গেল রাজ্য, গেল মান।" কাজেই এমন খেলাতে শকুণির পাশা খেলার নীতি অবলম্বনে সাহেবদের অন্ততঃ দ্বিধার কোন কারণ থাকার কথা নয়।

প্রকাশ্য বিক্ষোভ ভিন্ন পর্দার অন্তরালে এবং উঁচু মহলেও কিছু প্রতিবাদ হয়েছিল। সেই প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত রেফারীর গালে চুনকালি পড়েছিল।

থাক এখন এ' সব কথা। বিরতির সময় শেষ হয়ে এসেছে। মোহনবাগান এখনও এক গোলে পিছিয়ে আছে।

এক গোলে পিছিয়ে আছে দল। খেলার দ্বিতীয়ার্ধ অবশ্য বাকী। এ' সময়ে দেখা গেল খেলাতে কূটকৌশল বিস্তারে শিবদাসের প্রতিভা। তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরণ করে সৃষ্ট হয়েছিল তিলোত্তমা। আমাদের দেখা সামাদ, কুমার ও সূর্য চক্রবর্তীকে মিশিয়ে বোধ হয় তৈরী হয়েছিল আমাদের না-দেখা একমেবাদ্বিতীয়ম্ শিবদাস।

সাধারণতঃ খেলোয়াড়েরা খেলে পায়ে, মাথায় করে পরিকল্পনা। শিবদাস খেলতেন মাথা খাটিয়ে; সেই খেলা রূপান্তরিত হত তার

পায়ে। নৌকার পালের সঙ্গে হালের যে সম্বন্ধ শিবদাসের মাথা ও পায়ের সঙ্গে ছিল সেই সম্পর্ক। পালে লাগে বাতাসের গান, হালে জাগে ঢেউয়ের নাচন।

দল আছে পিছিয়ে, সুতরাং নেমেই মরণ কামড় দেবার চেষ্টা করতে হবে। সকলেই হয়ত তাই করত। শিবদাস কিন্তু গেলেন আরো এগিয়ে। মাঠে নামার আগেই প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল স্থির করলেন।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ফুটবল খেলাতে আক্রমণ এবং রক্ষণ বিভাগের খেলোয়াড়েরা অনবরতই স্থান পরিবর্তন করে থাকেন। ১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকে ফুটবলের স্বর্ণপদক বিজয়ী জার্মান দলে নাকি এক গোলরক্ষক ভিন্ন আর কোন স্থিতিশীল খেলোয়াড় ছিল না। কিন্তু ষাট বছর পূর্বে খেলোয়াড়দের নির্দিষ্ট স্থানে থেকে নির্ধারিত কর্তব্য করাই ছিল খেলার রীতি ও নীতি।

শিবদাস কিন্তু সেই সুদূর অতীতেই স্থান পরিবর্তনের কৌশলের সাহায্যে কার্য উদ্ধার করেছিলেন। উটেন এবং ইডেন কড়া নজর রেখেছিলেন শিবদাসের উপর। পালিয়ে বেড়াবার ফন্দী আঁটলেন শিবদাস। দু' ভাই এর চেহারার অদ্ভুত মিলের জন্য এ' কাজ কিছু সহজতর হল।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে গোটা দুই এদিক ওদিক আক্রমণের পর জে, রায় ডান দিক থেকে চলে গেলেন একেবারে বামে শিবদাসের জায়গাতে। শিবদাস নিজে হলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং এ, ঘোষ তখন খেলছেন রাইট আউটে। বিভ্রান্ত হল মিডল্‌সেক্‌স দলের রক্ষণ বিভাগ; সফলকাম হলেন শিবদাস।

এ' স্থান পরিবর্তনের উল্লেখ করে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখেছিলেন, "কিছুক্ষণ খেলার পর দেখা গেল ছোট ভাদুড়ি হয়েছেন আক্রমণের নেতা এবং তার জায়গাতে খেলছেন জে, রায়। এ, ঘোষকে তখন খেলান হয়েছিল রাইট আউটে।"

স্থান পরিবর্তন এই সংবাদপত্রের চোখে পড়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারেন নি তারা এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত রহস্য।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ বললেন, "সাময়িক বিরতির পর মোহনবাগানের খেলাতে সাহসের সামান্যতম অভাবও পরিলক্ষিত হল না। পরিপূর্ণ বিক্রমেই তারা আক্রমণ চালাল। এ' সময়ে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে খেলা হচ্ছিল এবং খেলাটি তখন তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উভয় দলই তখন সমান তালে আক্রমণ করছে এবং উভয় গোলেই সট হচ্ছে। মুখার্জি এবং পিগট উভয়েই এ' সময়ে বিশেষ আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কয়েকটি জোরাল সট বাঁচিয়েছিলেন।"

"এমন সময় দেখা গেল যে ছোট ভাদুড়ি হয়েছেন আক্রমণের নেতা এবং তার জায়গাতে খেলছেন জে, রায়। এ, ঘোষ তখন রাইট আউটে। এমন অপ্রত্যাশিত স্থান পরিবর্তনে সৈনিক দলের রক্ষণ বিভাগ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হল এবং সেই সুযোগে পরিশোধ-মূলক গোলটি করল মোহনবাগান।"

গোলটি সম্বন্ধে এ' সংবাদপত্র মন্তব্য করলেন, "লেফ্‌ট লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গেলেন জে, রায়। দৌড়ের উপরেই মারলেন রকেটের মত জোরাল সট। বলটির গতিপথ নির্ধারণে পিগটের মারাত্মক ভুল হল। গোল ছেড়ে এগিয়ে এলেন পিগট, কিন্তু তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল বল। পোষ্ট এবং বারের সংযোগ কোণ দিয়ে বলটি প্রবেশ করল জালে।"

পরিশোধমূলক গোলটি হল। মোহনবাগান এখন আর পিছিয়ে নেই; সমান সমান। ঠেলাঠেলি নেই, দাবী দাওয়া নেই এবং নেই লাইন্‌সম্যানের সঙ্গে কানাকানি এবং পরামর্শ। হয়েছে-কি-হয়-নি গোছের গোল নয়; পরিষ্কার গোল। শুধু পরিষ্কার গোল নয়, গোলের মত গোল।

দর্শকগণ তখন আনন্দে আত্মহারা। চীৎকার করতে করতে গলা ফেটে গেল, তবু চীৎকারের বিরাম নেই। সেই চীৎকারে কানে তালা লাগল সাহেবদের।

এ' আনন্দ উচ্ছ্বাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখলেন, "ভারতীয় দর্শকদের সু-উচ্চ এবং সুদীর্ঘ চীৎকারে এক অভাবনীয় উত্তেজনাময় পরিবেশ সৃষ্টি হল। কয়েক মিনিট ধরে এ' চীৎকারের বিরাম নেই। চীৎকার শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেল।"

অগ্রগামী হয়ে থাকার সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সৈনিক দল ক্ষেপে গেল। তীব্র আক্রমণকে তীব্রতর করতে চাইল দৈহিক শক্তির অপব্যবহার করে। মোহনবাগানের বুকে কিন্তু এখন নূতন আশা। তারাও জয়লাভের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল।

খেলার শেষ কয় মিনিট সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, "উভয় দলই এ' সময়ে কয়েক বার চমকপ্রদ ভাবে আক্রমণ করল। উভয় দলের সমর্থকবৃন্দই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। মুখে তাদের আশা-নিরাশার আলো-ছায়ার খেলা। ড' একবার হ্যাণ্ডবল করলে সৈনিক দল সঙ্কটের সম্মুখীন হল। সে' বিপদ কাটিয়ে মিডল্‌সেক্‌স শেষ দিকে জোর চাপ দিয়েছিল। সে' সময় নীলমাধব নিজ গোলের দিকে বল মেরে দলের সর্বনাশ প্রায় ডেকে এনেছিলেন। কপাল ভাল, বলটি গেল বাইরে দিয়ে এবং খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল।"

মোহনবাগান : এইচ মুখার্জি; এ. সুকুল ও এস. চ্যাটার্জি; এম. মুখার্জি, আর. সেনগুপ্ত ও এন. ভট্টাচার্য; জে. রায়, এস. সরকার, এ. ঘোষ, বি. ভাদুড়ি ও এস. ভাদুড়ি (অধিনায়ক)।

১ম মিডল্‌সেক্‌স : পিগট (অধিনায়ক), ইডেন ও ডাভ; টিগুল, উটেন ও ক্লার্ক; ষ্টেইন্‌স, বেভিন, ড, এট্‌কক ও ওয়াল।

রেফারী : প্রাঃ ম্যাকিন্‌টস।

দু'দলেরই মান এবং মুখ রক্ষা হল, কারণ শেষ পর্যন্ত খেলা রইল অমীমাংসিত। অমীমাংসিত খেলারও মীমাংসা হল পরের সংঘর্ষে, কিন্তু প্রথম দিন মোহনবাগানের গোলটি কে করেছিলেন সে সম্বন্ধে মীমাংসা আর কোন দিনই হবে না।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের মতামত আগেই উল্লেখ করেছি। ষ্টেট্সম্যান ও (২৫.৭.১১) গোলটি জে. রায়ই করেছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মোহনবাগানের প্লাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থে কিন্তু একজন লিখেছেন, "গোলটি এসেছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে। একটি দূর পাল্লার উঁচু সট থেকে গোলটি হয়েছিল। (কে বলটি মেরেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি।) বলটির গতিপথ নির্ধারণে মারাত্মক ভুল করে পিগট দৌড়ে এগিয়ে এলেন। মাথার উপর দিয়ে বলটি পড়ল গোলের মুখে। পিগট শেষ মুহূর্তে সর্বনাশ এড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শিবদাস ছিলেন নিকটে। ব্যাঘ্র ঝম্পে বলটি ধরে চোখের পলকে গোল করলেন।"

সে' লেখক এ' খেলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তিনি কোন্ সূত্রের ভিত্তিতে এ' অভিমত প্রকাশ করেছেন তা'ও আমার অজানা। কিন্তু তার বর্ণনার সঙ্গে ইংলিশম্যানের বর্ণনার প্রচুর মিল আছে, যদিও প্রধান বিষয়ে আছে গরমিল।

ইংলিশম্যানের মতে (২৫.৭.১১) "গোলটি হয়েছিল একটি দূর পাল্লার সট থেকে। (কে বলটি মেরেছিলেন সে' সম্বন্ধে সে' লেখকের মতে এ' সংবাদপত্রও নীরব)। পিগট এই একটি ভুল করলেন। গোল ছেড়ে কিছু এগিয়ে এলেন কিন্তু বলটি চলে গেল তার মাথার উপর দিয়ে। প্রাণপণ চেষ্টাতে পিগট তবু বলে হাত লাগালেন, কিন্তু বিজয়দাস ছিলেন কাছে দাঁড়িয়ে। তিনি বলটিকে গোল লাইনের ওপারে আরো ঠেলে দিয়ে নিশ্চিতকে নিশ্চিততর করলেন।"

আর আমাদের গণেন মল্লিক কি বলছেন? তিনি কিছুই বলছেন না। আশ্চর্য! এমন নাটকীয় পরিস্থিতিতে তিনি উধাও। মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে দু'দিনের খেলাতে গণেন মল্লিকের দেখা নেই।

বিভিন্ন বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে যে গোলটি হয়ত জে, রায়ের সটেই হয়েছিল। কিন্তু রেফারীর কথা মনে রেখে ভাদুড়ি ভাইদের মধ্যে একজন আর কোন সন্দেহ রাখলেন না। কিন্তু কে তিনি—বিজয়দাস, না শিবদাস? তাদের চেহারার সাদৃশ্যে শুধু প্রতিপক্ষই বিভ্রান্ত হয় না; প্রত্যক্ষদর্শীরও ধোঁকা লাগে।

গোলটির কৃতিত্ব যারই হোক, এ' মহামূল্য গোলটির মাধ্যমেই আর একদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য মোহনবাগান টিকে রইল। এ' গোলটি প্রমাণ করল যে সঙ্কট কালে উজ্জীবিত হবার মত গোপন সঞ্চয় মোহনবাগানের আছে।

প্রমাণ করল, মরার আগে মোহনবাগান মরে না।

* * *

মোহনবাগান বেঁচেই রইল এবং ফাইন্যালে উঠল।

১ম মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ; অমীমাংসিত প্রথম সেমি-ফাইন্যালের জের এবং পুনরাবৃত্তি।

খেলা হয়েছিল একদিন বিশ্রামের পর ২৬শে জুলাই। সেই ডালহৌসি মাঠে।

এবার ঘটনাবহুল খেলা।

সৈনিক দল মোহনবাগানের সমাধি রচনা করবে এ' আশংকা এখন আর জনসাধারণের মনে নেই। গাঁট পেরিয়েছে; ভাগ্যের জোরেই হোক কিংবা ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যই হোক রাইফেল ব্রিগেড দলকে হারিয়েছে মোহনবাগান। একটি বহু বিতর্কিত গোলের বোঝা মাথাতে করেও মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ করে সসম্মান প্রতিযোগিতা করেছে।

এখন সমর্থকদের মনে আশংকার কালো মেঘ আর নেই। আছে আশার আলো।

পূর্ব খেলার পুনরাবৃত্তি; জনসাধারণের উৎসাহ বরং এদিন আরো বেশী। প্রথম দিনের শোধবোধ খেলার পর সকলেই এখন আশাবাদী এবং উত্তেজিত। মোহনবাগানের তরণী তর তর করে চলেছে তীরের দিকে। চলেছে ভরা পালে।

কিন্তু ভরাডুবির আশংকা যে তাদের মনে নেই এমন নয়। সাহেবরা যে রেফারীর ইচ্ছাকৃত অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে না জিতেও জিততে চায়। গোল না করেও গোলের দাবী করে। সে দাবী রক্ষিতও হয়। এ'দিনও আবার কি হবে কে জানে? শ্যামের বাঁশি কোন্ সুরে বাজবে তাই নিয়ে তুমুল আলোচনা।

আবার মাঠে লোকে লোকারণ্য।

হঠাৎ গগনে বাদল।

সারা দিন ছিল সুন্দর আবহাওয়া; ঝলমলে রোদ। দলে দলে লোক মাঠে এসেছে হাসি মুখে। রেফারী হয়ত বাদ সাধবে, কিন্তু আপাততঃ বরুণদেব করুণা করেছেন। এমন মাঠে মোহনবাগান লড়বে বুক চিতিয়ে। কিন্তু দেখতে না দেখতে সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। হঠাৎ গগনে বাদল।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নে বাদল, পরাণে বাদল ছাইয়া।

খেলার মাত্র আধ ঘন্টা বাকী। এমন সময়ে একটি ভাসমান মেঘ দেখা গেল মাঠের উপরের আকাশে। নেমে এল এক পশলা বৃষ্টি; বেশ জোর বৃষ্টি। জলসিক্ত হল সকলের চোখ। বুঝি বা এ' বৃষ্টিতেই ভেসে যাবে এত লোকের এত দিনের সব আশা ভরসা।

কিন্তু বৃষ্টি যেমন হঠাৎ এসেছিল থেমেও গেল তেমনি হঠাৎ। তবু সকলেরই মন বিষণ্ণ। মাঠ যে একটু নরম, একটু শ্লথগতি হয়ে গেল। মোহনবাগানের নিশ্চয়ই একটু অসুবিধা হবে। কি করা যাবে? মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের খেলার মাঠের কথা মনে করে সকলে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। সে দিনও মাঠ ঠিক মোহনবাগানের অনুকূলে ছিল না। এ' মাঠ নরম হলেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা করবে না বলেই তাদের ধারণা। দেখা যাক কি হয়।

বৃষ্টিপাতের উল্লেখ করে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (২৭ ৭.১১) বলেছিলেন, "খেলার আধঘণ্টা আগে হঠাৎ বৃষ্টি হল। এ' বৃষ্টির ফলে মাঠ পিচ্ছিল হয়ে গেল এবং খেলার গতিবেগ কিছু পরিমাণে ব্যাহত হল।"

কিন্তু রেফারী মাঠে নামা মাত্রই জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কি! এ' ত প্রাঃ ম্যাকিন্‌টস নয়; এ' ত আগের দিনের রেফারী নয়। বিস্মিত হল বিশাল জনতা; চোখ কচলে আবার দেখল। অমীমাংসিত সেমি-ফাইন্যাল খেলাতে সাধারণতঃ রেফারী পরিবর্তনের রীতি নেই। তাই রেফারী বদল হবে এমন আশা দর্শকেরা করে নি। জনতা আশ্বস্ত হল, মনে মনে খুসী হল। নূতন রেফারী হল পুলার।

সেদিন জনতা যে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল তা' একেবারে বিফল হয় নি। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ তাদের প্রতি অযাচিত উপদেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সেদিনের খেলা দেখতে মাঠে আই, এফ, এর কর্তাব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা ফুটবল আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ নন এবং তারা সবই দেখেছিলেন। প্রাঃ ম্যাকিন্‌টসের ক্রীড়া পরিচালনাতে তারাও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মোহনবাগানের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ না হলেও আই, এফ, এ-র উঁচু মহল নিজেরাই পরামর্শ করে রেফারী পরিবর্তন করেছিলেন।

এ' প্রকার রেফারী বদল নিয়ে কোন সংবাদপত্রই কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নি। কেমন করে নূতন রেফারী নিয়োগ হল সে' সম্বন্ধে তারা কিছুই বলেন নি। ধরে নেয়া যেতে পারে যে তারাও ম্যাকিন্‌টসের খেলা পরিচালনা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি। যা হোক, নূতন রেফারী পুলারের নিজ বক্তব্য থেকেই প্রকাশ পেল রেফারী পরিবর্তনের রহস্য।

মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থে নিজের স্মৃতি-চারণ করে ১৯৬৪ সালে মিঃ পুলার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন, "আই, এফ, এ-র সেক্রেটারী মিঃ রিড্‌স আমাকে এ' সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি পরিচালনা করতে আমি রাজী আছি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সানন্দে এ' প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।"

অমীমাংসিত সেমি-ফাইন্যাল খেলাটির পর আই, এফ, এ-র উঁচু মহলে নিশ্চয়ই সেদিনের ক্রীড়া পরিচালনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। নতুবা নিজ দায়িত্বে মিঃ রিড্‌স এমনভাবে রেফারী পরিবর্তনে উদ্যোগী হতেন না।

কিন্তু বর্তমানের খেলার পরিস্থিতিতে আমি ভাবছি অন্য কথা। রেফারী পরিবর্তন না হয় হল, কিন্তু পুলারকে রেফারী স্থির করা হল কেমন করে? চলতি শীল্ড প্রতিযোগিতাতেই পুলার ক্যালকাটা দলের হয়ে সেমি-ফাইন্যালে খেলেছিলেন। অবশ্য সে খেলাতে ক্যালকাটা দল হেরে গিয়েছিল সুতরাং প্রতিযোগিতাতে পুলারের এখন ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ নেই। কিন্তু আজ যদি সেমি-ফাইন্যালের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে পূর্বে পরাজিত একটি দলের কোন খেলোয়াড়কে রেফারী হিসাবে নির্বাচিত করা হয় তা'হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? সে সময়ে অবশ্য কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম হত। তার উপর পুলার যখন ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্য তখন তাকে ধোয়া তুলসী পাতা বলেই বিবেচনা করতে হবে।

যাক, পুলার হলেন নূতন রেফারী। মাঠে নেমে বাঁশি বাজালেন। উভয় পক্ষই পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন দল নিয়ে মাঠে অবতীর্ণ হল। কোন দলেই কোন পরিবর্তন নেই। আগের দিন যারা যারা খেলেছিলেন তারাই আজ আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

খেলা শুরু হল এবং যথাসময়ে সাঙ্গও হল। ৩-০ গোলে বিজয়ী হয়ে মোহনবাগান উঠল ফাইন্যালে। মোহনবাগানের জীবনের সর্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড ফাইন্যাল।

লিখলেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (২৭. ৭. ১১) "কলিকাতা ফুটবলের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় দল আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠেছে। চরম পর্যায়ে প্রবেশের পথে উপর্যুপরি কয়েকটি খেলাতে এ' দল যে অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তা' ফুটবল প্রেমিকদের বহুদিন মনে থাকবে।"

"পুনরনুষ্ঠিত এ' সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি দেখতে বুধবার ডালহৌসি মাঠে রেকর্ড জন-সমাবেশ হয়েছিল। এ' জনতা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রত্যেকটি লোক অনবরত গলাফাটা চীৎকার করে মোহনবাগানকে সমর্থন জানিয়েছে। মাঠে এ' দিন যে উৎসাহ, উল্লাস এবং উত্তেজনা দেখা গিয়েছে কলিকাতার খেলার ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। যোগ্যতর দল হিসাবেই মোহনবাগান এ' দিন ৩-০ গোলে বিজয়ী হয়েছে।"

তারপর এ' সংবাদপত্র যোগ করলেন, "খেলার বিশদ আলোচনার পূর্বেই আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে মোহনবাগান এ' দিন প্রধানতঃ তিনটি কারণে জয়লাভ করেছে। প্রথম, তাদের ক্ষিপ্র গতিতে পরিচ্ছন্ন খেলা, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং দলগত ও ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্য; দ্বিতীয়, গোলরক্ষক পিগটের আঘাত প্রাপ্তি; এ আঘাতের পর দ্বিতীয়ার্ধের সব সময়েই তিনি খেলেছেন আচ্ছন্নতার ঘোরে এবং তৃতীয়, দ্বিতীয়ার্ধে সৈনিক দলের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দৈহিক শক্তির অপব্যবহার।"

তারা তখন নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে আইন ভঙ্গ করে খেলেছে এবং রেফারী ঘন ঘন তাদের বিরুদ্ধে বাঁশি বাজিয়েছে।"

খেলাতে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় না ঘটলে ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্র সৈনিক দলটি সম্বন্ধে এমন বিরূপ মন্তব্য করতেন কি না তা বলা কঠিন। রণে এবং প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই। (There is nothing unfair in love and war.) এ' ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটির উপর ইংরাজদের অগাধ আস্থা। ইংরাজরা নীতি-বাগীশ হন কেবল শেষরক্ষা না হলে।

সামান্য প্রস্তাবনার পর তারা মুখ খুললেন। বললেন, "প্রথমার্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এবং মোহনবাগান গোলের সম্মুখে অনাবশ্যক বল আদান প্রদান করে মিডল্‌সেক্‌স দল বহু সুযোগের অপচয় করেছে। তবু কলিকাতার সমস্ত সমঝদার ক্রীড়া রসিকেরাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে পঞ্চাশ মিনিটের খেলাতে মোহনবাগান সকল সময়ই মিডল্‌-সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে সমান প্রতিযোগিতা করেছে। খেলার অধিকাংশ সময়ই সুদৃঢ় মোহনবাগান রক্ষণ বিভাগ সৈনিক দলের পথরোধ করেছে। কিন্তু খেলার শেষ দশ মিনিটে মিডল্‌সেক্‌স দলকে নিয়ে ছেলেখেলা করে মোহনবাগান পরপর তিনটি গোল করেছে।"

"প্রথমার্ধে উভয় দলই সমান তালে আক্রমণ করেছিল। এ' সময়ে মোহনবাগানের বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে সৈনিক দল কয়েক বারই বিশেষ বিব্রত বোধ করেছিল। দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে কিন্তু সৈনিক দলের পরিস্ফুট প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এ' সময়ে সৈনিক দলের ত্রুটিতে বার বার বাঁশি বাজল তাদের বিরুদ্ধে। এ' কারণে মিডল্‌সেক্‌স দলের আক্রমণের ছন্দপতন হল এবং পক্ষান্তরে সুবিধা হল মোহনবাগানের।"

প্রথমার্ধে পিগটের চোখে চোট লাগার পূর্ব পর্যন্ত খেলাতে সৈনিক দলেরই আপেক্ষিক প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তখন তারা অপ্রয়োজনীয়

ভাবে বল পায়ে রেখে অনাবশ্যক আদান প্রদানের মাধ্যমে সুযোগের অপচয় করেছিল। তৎপরতার সঙ্গে গোলে সট করলে মিডল্‌সেক্‌স হয়ত এ' সময়ে অগ্রগামী হতে পারত।

সৈনিক দলের ত্রুটিতেই সুকুল, চ্যাটার্জি, রাজেন ও মুখার্জি দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। পিগটের চেয়ে অবশ্য হীরালালকেই বেশী কর্মব্যস্ত দেখা গিয়েছিল। তবু সৈনিক দল তখন মোহন-বাগানের তেমন কোন উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করতে পারে নি। মোহন-বাগানের পক্ষে একবার জে, রায় ও অন্যবার হাবুল সরকার প্রশংসনীয় ভাবে গোল করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে পিগট তাদের ব্যর্থ মনোরথ করেন।

প্রথমার্ধ সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য নেই। কেবল বলতে বাকী রইল যে এ' ভাবে প্রথমার্ধ গোলশূন্য রকমে শেষ হল।

কিন্তু এ' দিন প্রথমার্ধের খেলাকে অনেক ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল এ' সময়ের দুটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা।

প্রথমার্ধ গড়িয়ে চলেছে নিম্বু-পাণির বিরতির দিকে। মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। এ. ঘোষ তখন ছুটে চলেছেন শিবদাসের দেওয়া একটি বল ধরতে; পাশে ছুটছেন সরকার। বল চলে গেছে ইডেনকে অতিক্রম করে। বিপদ আশঙ্কা করে মিডল্‌সেক্‌স দলের গোলরক্ষক পিগট এগিয়ে এসেছেন। আক্রমণকারী অভিলাষ এবং রক্ষণকারী পিগটের মধ্যে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান। মাঝখানে বল।

পিগট ঝাঁপিয়ে পড়লেন বলের উপর। তার সহায়তায় আসতে গিয়ে ইডেনও স্খলিত পদে পড়লেন তার পাশে। হাবুলবাবুও ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন সেখানে। ঠিক এ' সময়ে অভিলাষ ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পড়ে গেলেন এবং ছড়্‌ড়া কাটার ভঙ্গীতে তার দুই পা এগিয়ে গেল সেই জটলার দিকে। অভিলাষের পা লেগে গেল পিগটের কপালে; চোখের উপরে লাগল নখের খোঁচা।

ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

অভিলাষ—আর কিন্তু অভিলাষ নয়; এখন 'কালো দৈত্য'—উঠে দাঁড়ালেন। পিগট কিন্তু তখনও অচৈতন্য। অভিলাষ এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। সৈনিক দলের অনেকেই এল তার শুশ্রূষার জন্য। ডাক্তারও ছুটে এলেন। কিছুক্ষণ পর পিগটের চৈতন্য হল; তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজের আড়ালে তখন তার একটি চোখ ঢাকা। কিন্তু বাহাদুর বটে পিগট; ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখ নিয়েই গোল রক্ষা করতে লাগলেন। সাবাস!

এ' দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ষ্টেট্সম্যান (২৭. ৭. ১১) লিখেছিলেন, "স্থানীয় গোলরক্ষকের শিরোমণি পিগট মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ডের পায়ের ধাক্কাতে আহত হলেন। তাঁর বাম চোখের উপর গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল। কয়েক মিনিট পিগট অচৈতন্য হয়েই ছিলেন। তারপর অবশ্য অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়ে তিনি আবার স্বস্থানে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখন আঘাতের চোটে তিনি বেসামাল এবং চোখে তার ব্যাণ্ডেজ। পিগটের তখন অসুবিধার অন্ত নেই।"

ইংলিশম্যানও অনুরূপ মন্তব্য করলেন। কেউ কিন্তু অভিলাষকে ব্যক্তিগতভাবে দোষী করলেন না। রেফারী অভিলাষকে সতর্ক করেও দিলেন না, কেবল ফাউল দিলেন। পিগটের আঘাত সম্বন্ধে পরে পুলার বলেছিলেন, ''একটি জটলার মধ্যে অভিলাষের পায়ের লাথি লাগল পিগটের কপালে। অভিলাষের খেলাকে বিপজ্জনক মনে করে আমি তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দিলাম।"

পুলারের বক্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেছিলেন, "দুঃখের বিষয় যে এ' আঘাতের ফলে পিগটের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (Concussion) হল। আমার মনে হল এমন অবস্থাতে তার খেলা অনুচিত। দলের সহ-অধিনায়ককে আমি এ' কথা বললাম। কিন্তু দলে গোলরক্ষা করতে পারে এমন আর কেউ নেই বলে তিনি আমার

কথা শুনলেন না। ফলে এ' সময়ে মোহনবাগান তার বিরুদ্ধে দুটি সহজ গোল করে শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে বিজয়ী হল।"

দুর্ঘটনার এক সপ্তাহ পর পিগট নিজে নাকি পুলারকে বলেছিলেন, "খেলার শেষে ২৪ ঘণ্টা একটানা ঘুমের পর যখন আমি একটু সুস্থ হলাম তখন এ' দুর্ঘটনা বা খেলার ফলাফল সম্বন্ধে কোন স্মৃতিই আমার ছিল না।"

এ' সংবাদও জানা যাচ্ছে মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থে পুলারের লিখিত একটি রচনা থেকে।

খেলাতে এমন দুর্ঘটনা অবশ্য বিরল নয়। মাঝে মাঝে খেলোয়াড়েরা আরো গুরুতর আঘাত পেয়ে থাকেন। এই কলিকাতার মাঠেই আর একটি সেমি-ফাইন্যাল খেলার কথা মনে পড়ছে। সেদিন এক গোলরক্ষককে আহত হয়ে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। পরে তাকে আর খেলার মাঠে কখনও দেখা যায় নি।

কিন্তু অতঃপর খেলার মাঠে যা' ঘটল তার কোন নজির আমার জানা নেই। প্রচণ্ড ভীড়ই ছিল দ্বিতীয় দুর্ঘটনার কারণ। মোহন-বাগানের দিকের গোলপোষ্টটি হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ষ্টেট্সম্যান (২৭.৭.১১) বলেছিলেন, "মাঠে এত লোক হয়েছিল যে বহু লোক গোলের পিছনে জালের উপরেই বসেছিল। তাদের চাপে গোলপোষ্টটি গেল এ' সময়ে ভেঙ্গে। বহু সময় নষ্ট হল আবার নূতন পোষ্ট লাগাতে।"

ভাগ্য ভাল হীরালালের যে ভাঙ্গা পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়েও তার মাথা ফাটে নি। তা' নইলে সেদিন হীরালালকে একই নৌকাতে পিগটের সহযাত্রী হতে হত।

এ' দুটি দুর্ঘটনাকে জড়িয়ে পরবর্তী কালে ময়দানে একটি গল্পও চালু হয়েছিল। সেই গল্পের কথকদের মতে পিগটের নাকি *গোলপোষ্ট ভেঙ্গেই চোট লেগেছিল।* তারা দাবী করতেন যে *অভিলাষ ঘোষের* কাহিনীটি কাল্পনিক। এ' গল্প যারা বানিয়েছিলেন তাদের খেয়াল

ছিল না যে গোলপোষ্ট ভেঙেছিল মোহনবাগানের দিকে। প্রকৃতপক্ষে 'কালো দৈত্যের' সঙ্গে সংঘর্ষেই চোট লেগেছিল পিগটের চোখে। তাই অভিলাষ ঘোষের এ' নামকরণ। অভিলাষ তবু এ' ঘটনার নিমিত্ত মাত্র।

দ্বিতীয়ার্ধে মিডল্‌সেক্‌স দলের সমস্যা হল বড়ই কঠিন। পিগটকে আড়াল করে রাখতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রুখতে হবে মোহনবাগানকে। এ' দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৈনিক দল এ' সময়ে মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। বল যদি কোন মতে প্রতিপক্ষের এলাকাতে রাখতে পারে তবে পিগটের চোখের জন্য তেমন দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না।

সাময়িক ভাবে সফল হল সামরিক দলের এ' সমর কৌশল। বিরতির পর প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত মোহনবাগান আত্মরক্ষাতেই ব্যস্ত রইল। এট্‌কক এবং ষ্টেইন্‌স দু'বার কিছু উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, কিন্তু মোহনবাগানও দক্ষতা এবং দৃঢ়তা সহকারে প্রতিরোধ করতে থাকে। ভারতীয় দলের দুই ব্যাক এবং আর, সেনগুপ্ত খেলার এ' অবস্থাতে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সকলের সাধুবাদ অর্জন করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি কিন্তু খেলার গতি এবং প্রকৃতি নাটকীয় ভাবে বদলে গেল। চতুর শিবদাস এখন সৈনিক দলের স্নায়ুর উপর সূক্ষ্ম চাপের সৃষ্টি করলেন। পিগট আহত হওয়াতে সৈনিক দলের খেলোয়াড়েরা মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েই ছিল। শিবদাস এখন অন্য কৌশলে তাদের মেজাজ আরো বিগড়ে দিলেন। শিবদাস, বিজয়দাস ও হাবুল এখন মাঝ মাঠেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে পায়ে বল আটকে রেখে দিয়ে সৈনিক দলের খেলোয়াড়দের নাজেহাল করলেন। অনেকেই মনে করলেন যে তারা অনাবশ্যক বাহাদুরি দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করছেন। তা' কিন্তু নয়। এ' ভাবে বিব্রত হয়ে সৈনিক দলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল এবং তারা বল ছেড়ে খেলোয়াড়দের দিকে নজর দিল।

খেলার রেফারী পুলার এ' প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা আরম্ভ করল পায়ের কায়দা এবং কারিগরি দেখাতে। বল ধরতে না পেরে সৈনিক দল প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের উপর দৈহিক শক্তির অপব্যবহার আরম্ভ করল। এ' সময়ে একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মিডল্‌সেক্স।"

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (২৭.৭.১১) লিখলেন, "দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে দমদমের সৈনিক দল খেলাতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু অতঃপর হঠাৎ তাদের খেলাতে দেখা গেল উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দৈহিক শক্তির অপব্যবহার। আইন ভঙ্গের জন্য ঘন ঘন বাঁশি বাজান হল তাদের বিরুদ্ধে। ফলে, তাদের আক্রমণের ছন্দপতন ঘটল।"

খেলা এ'ভাবে গড়িয়ে চলেছে সমাপ্তির দিকে। আর দশ বারো মিনিট বাকী আছে। এ' সময়ে ভানুমতীর ভেলকি দেখালেন শিবদাস। এতক্ষণ মাঝ মাঠে বল নিয়ে ছেলেখেলা করছিলেন। এবার হঠাৎ বল ধরে দিলেন লম্বা দৌড়। আর, সেনগুপ্তের কাছ থেকে নিজেদের হাফ-ব্যাক সীমানার কাছাকাছি বলটি পেয়েছিলেন। সেই বল নিয়ে এগিয়ে চললেন শিবদাস।

পায়ে বল রেখে শিবদাস চলেছেন নেচে নেচে। দু জনকে প্রতারিত করে ঢুকলেন মিডল্‌সেক্স সীমানাতে। উটেন এগিয়ে এলেন বাধা দিতে। শরীরের মোচড়ে তাকে ধোঁকা দিয়ে শিবদাস বল দিলেন বাম দিকে বিজয়দাসকে। তৎক্ষণাৎ আবার ভাইকে বল ফেরৎ দিলেন বিজয়দাস এবং তিনি সৈনিক দলের কিংকর্তব্যবিমূঢ় দুই ব্যাকের মাঝ দিয়ে দিলেন একটি মাপা পাশ। ডানদিক থেকে দৌড়ে এসে সরকার করলেন গোল। (১-০)

গোল করার সম্মান পেলেন হাবুল সরকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এ' গোলটি ছিল শিবদাসের একক সৃষ্টি। তাঁর অপূর্ব ক্রীড়া প্রতিভার অনবদ্য অবদান।

ষ্টেট্‌সম্যানের মতেও প্রথম গোলটি করেছিলেন হাবুল সরকার। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের বর্ণনাতে আছে অন্য কথা। লিখছেন এ সংবাদপত্র, "খেলা শেষ হবার তখন দশ মিনিট বাকী। ভারতীয় দলের একটি চমকপ্রদ সম্মিলিত আক্রমণ থেকে শিবদাস মোহনবাগানের প্রথম গোলটি করলেন। বলটি প্রথমে প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে প্রতিহত হয়েছিল এবং সেই বল ধরেই শিবদাস করলেন গোল।"

জনসাধারণ রোমাঞ্চিত হল। আনন্দে মাতাল হয়ে গেল তারা।

গো···ল! গো···ল! গো···ল!

বহুবার, বহু বিভিন্ন অবস্থাতে এ' ঐক্যতান মাঠে শোনা গিয়েছে, এবং আরো বহুবার এ' চীৎকার শোনা যাবে। কিন্তু হাবুল সরকারের প্রথম গোলটির পর আকাশে বাতাসে যে চীৎকার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তার তুলনা আর পাওয়া যাবে না।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখলেন, "গোলটির পর দেখা গেল চরম উত্তেজনার এক অপরূপ চিত্র। দীর্ঘায়িত উল্লাস ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হল এবং সে' চীৎকারের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই হল মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল।"

ষ্টেট্‌সম্যানের বর্ণনা কিন্তু ছিল অনেক বিশদ, অনেক সুন্দর। এ' সংবাদপত্র বলছেন, "উঠেছে তুমুল হর্ষধ্বনি। গোলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল চীৎকার এবং সেই চীৎকারের বিরাম হল খেলার অবসানে। চীৎকার থামাবার সময়ই বা কোথায়?"

সত্যই চীৎকার থামাবার সময় নেই। গোলের পর আসছে গোল, সুতরাং না থামতেই আবার নূতন করে উঠছে চীৎকার।

"সমর্থকদের উৎসাহ তখন সংক্রামিত হয়েছে মোহনবাগান দলের মনে। যৌবন-জলতরঙ্গের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য তখন তাদের গতি। বাকী কয় মিনিটের মধ্যেই মোহনবাগান করল আরো দুটি গোল", বললেন ষ্টেট্‌সম্যান।

পরবর্তী খেলা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ বললেন, "প্রথম গোলের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রশমিত হতে না হতেই সন্দেহজনক অবস্থান থেকে সরকার সৈনিক দলের শবাধারে দ্বিতীয় পেরেকটি ঠুকে দিলেন। এ' গোলটির পর মিডল্‌সেক্‌স দলের সকল আশাই লুপ্ত হয়ে গেল। এখন স্পষ্টই তারা পরাজিত দল।"

এ' সংবাদপত্র প্রথম গোলটির কৃতিত্ব শিবদাসকে দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে অফসাইড থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন হাবুল সরকার। সমসাময়িক আর কোন সংবাদপত্র কিন্তু অফসাইডের কথা উল্লেখ করেন নি এবং তাদের মতে দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন শিবদাস।

"বল সেণ্টারে এল প্রথম গোলের পর", বলছেন ষ্টেট্‌সম্যান। "দু' পা ঘুরেই বল আবার এল শিবদাসের পায়ে। "শি···বু, শি···বু" চীৎকার চরমে উঠতে না উঠতেই দেখা গেল বল আবার জালের মধ্যে। এবার গোল করেছেন শিবদাস নিজেই।" (২-০)

বিদ্যুৎ যেমন মেঘের বুক চিরে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় শিবদাসও ঠিক তেমনি করলেন। পলকে সৃষ্টি করলেন প্রলয়।

গোলের পালা কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। এখনও বাকী তৃতীয় এবং শেষ গোল।

শেষ গোলটি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ বলছেন, "সৈনিক দলের রাইট হাফব্যাক টিগুলের ফাউলের অপরাধে মোহনবাগান একটি ফ্রি কিক পেল। সে' বলটি ধরে জে, রায় এগিয়ে গিয়ে নীচু সট করে তৃতীয় গোলটি করলেন।"

"খেলার তখন এক মিনিট বাকী", বলছেন ষ্টেট্‌সম্যান। চীৎকার উঠেছে, "কানু, কানু"। কানু (জে, রায়) তখন ছুটে চলেছেন ডান-দিকের লাইন ধরে। অতর্কিতে বাম দিকে মোড় নিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন ভিতরে এবং বল গেল জালে।" (৩-০)

খেলার বর্ণনা শেষ করে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ কিন্তু সৈনিক দলের জন্য কিছু কাঁদুনি গাইলেন। "এঁকে সৈনিক দলের আক্রমণে এদিন তেমন সংবদ্ধতা ছিল না", লিখলেন এ' সংবাদপত্র। "তার উপর মোহনবাগানের গোলের সামনে গিয়েও তারা বারবার এলোমেলো শট করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। প্রচণ্ড চাপের বিরুদ্ধে মোহনবাগান যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে প্রতিরোধ করছে তখনও কিন্তু ভারতীয় দলের রক্ষণ বিভাগ প্রশংসনীয় স্থৈর্য এবং প্রীতিপ্রদ নৈপুণ্য দেখিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। সৈনিক দলের রক্ষণ বিভাগ তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। আহত পিগটের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখ—এ' বাধার বিরুদ্ধে এমন পরাজয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

এক গ্রাম্য ব্যক্তি জমিদারের হাতে নিগৃহীত হয়ে ছেলেকে চিঠি লিখেছিল, "কর্তা আমাকে কানে ধরিয়া উঠ-বোস করাইয়াছেন এবং পরে অপমান করিবে বলিয়া শাসাইয়াছেন।" এ' খেলাতে সাহেব সুবোদের উঠ-বোস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারা অপমানিত হতে নারাজ। তাই ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন যে পিগট এখন এক-চোখো হরিণ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অন্য চোখে। এখন তার বিরুদ্ধে গোল করার মধ্যে আর বাহাদুরি কি?

কিন্তু পিগট গোলরক্ষক, স্থান তার সকলের পশ্চাতে। তার সামনের দু-চোখওয়ালা দশ জনের তখন ধাঁধা লেগেছে মোহনবাগানের সম্মিলিত ক্রীড়াচাতুর্য্যে এবং বিশেষ করে শিবদাসের প্রতিভার দীপ্তিতে। সৈনিক দল তখন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, ছত্রভঙ্গ এবং বিপর্যস্ত। নইলে দশ মিনিটের মধ্যে তিন তিনটি গোল। পিগটের চোখের অজুহাত চলবে না। অন্তঃত প্রথম দুটি গোল সম্পূর্ণ চক্ষুষ্মান্ পিগটের পক্ষেও প্রতিরোধ করা ছিল অসম্ভব।

এক—দুই—তিন !!!

৩-০ গোলে বিজয়ী হয়ে মোহনবাগান উঠল আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইন্যালে। ভারতীয় দলের সর্বপ্রথম শীল্ড ফাইন্যাল।

ঐতিহাসিক ঘটনা, অপূর্ব সম্মান।

মোহনবাগান ঃ এইচ, মুখার্জি ; এ, সুকুল ও এস, চ্যাটার্জি ; এম, মুখার্জি, আর, সেনগুপ্ত ও এন, ভট্টাচার্য্য ; জে, রায়, এস, সরকার, এ, ঘোষ, বি, ভাদুড়ি, ও এস, ভাদুড়ি (অধিনায়ক)।

১ম মিডল্‌সেক্‌স ঃ পিগট (অধিনায়ক) ; ইডেন ও ডাভ ; টিগুল, উটেন ও ক্লার্ক ; ষ্টেইন্‌স, বেভিন, ড, এট্‌কক ও ওয়াল।

রেফারী ঃ মিঃ পুলার।

অপূর্ব সম্মানের অধিকারী এখন মোহনবাগান। কিন্তু ফুটবল মাঠের এ' সম্মান নিয়ে জনসাধারণের মনে তেমন কোন উত্তাপ নেই। তারা অবাক বিস্ময়ে কেবল দেখছে যে দু' দুটো জাদরেল সৈনিক দল নিয়ে চারটি সাহেব দল কূপোকাৎ হয়েছে বাঙ্গালী মোহনবাগান দলের কাছে।

ব্যর্থ, বঞ্চিত বাঙ্গালী বহুদিন পর তাই অনুভব করছে সার্থকতার স্বাদ।

এখন মোহনবাগান সুবর্ণ সম্ভাবনার সিংহদ্বারে উপস্থিত।

সঙ্গে আছে বাংলা ও বাঙ্গালী।

*　　*　　*

এল ২৯শে জুলাই।

এল ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিন ; সোনার অক্ষরে লেখা দিন। বাঙ্গালীর মনে চির-ভাস্বর একটি দিন।

এল বহু ঈপ্সিত, বহু প্রতীক্ষিত আই, এফ, এ শীল্ড ফাইন্যাল।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ফাইন্যাল। একটি ভারতীয় দলের সর্বপ্রথম শীল্ড ফাইন্যাল।

এমন দিন আগে আর আসে নি, পরেও আর আসবে না।

ঐতিহাসিক খেলাটি হয়েছিল ক্যালকাটা মাঠে। ক্রীড়াক্ষেত্র রূপান্তরিত হল কুরুক্ষেত্রে। এক দিকে বাংলা ও বাঙ্গালীর মোহন-বাগান ; অন্য দিকে ফৈজাবাদ থেকে আগত অমিত শক্তিশালী সৈনিক দল ইষ্ট ইয়র্কস।

সে' খেলাতে ২-১ গোলে বিজয়ী হয়েছিল মোহনবাগান।

তিনটি রেকর্ড হয়েছিল সে' খেলাতে। প্রথম, অকল্পনীয় জন সমাগম ; দ্বিতীয়, ভারতীয় দলের ঐতিহাসিক জয়লাভ এবং তৃতীয়, চ্যারিটি খেলা থেকে অসামান্য অর্থাগম।

বিজয়ীর মুকুট মোহনবাগানের মাথাতে শোভা পেয়েছিল ফাইন্যাল খেলার পর। কিন্তু ফাইন্যাল খেলার পূর্বে পায়ের নখের আকস্মিক সেই এক আঘাতে বেঁধে গেল হুলস্থুল।

আদিতে পিগটের পতন ও মূর্ছা। অন্তে মিডেল্‌সেকস দলের ৩-০ গোলে পরাজয়, এবং সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় দলের আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইন্যালে আবির্ভাব।

সে' ভারতীয় দল মোহনবাগান ; ১৯১১ সালের মোহনবাগান।

এ' দুর্ঘটনার কথা আগেই যথাস্থানে বলা হয়েছে। কিন্তু বাকী আছে অতঃপর কলিকাতার ইঙ্গ সমাজের মুখে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের কথা।

"স্বকর্ণে শোনা আমার। ওরা বলাবলি করছে"—লিখলেন "লেভলার" ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে (২৯. ৭. ১১)। "ওরা করুণ কণ্ঠে বলাবলি করছে যে মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের পায়ের নখগুলি একটু ছোট করে কাটতে অনুরোধ করা কি একেবারেই অসম্ভব ? নইলে পিগটের চোখ গেছে, এবার ক্রেসিরও যাবে।"

ক্রেসির আঘাতের আশংকা কল্পনা করেই ইঙ্গ সমাজ চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাই তাদের মুখে এ' প্রলাপ। হাজার হোক,

খেলবে সাহেব সুবোদের বিরুদ্ধে। সে' কথা বিবেচনা করেও নেটিভ বাবুদের একটু সাফ-সুতরো হয়ে মাঠে নামা উচিত।

"লেভেলার" বক্রোক্তি করে জবাব দিলেন, "আরে বাবা! নেটিভের পায়ের নখ বুটের স্পাইক নয়। সে' সম্বন্ধে ফুটবলের কোন আইন-কানুন নেই। অতএব—"

ব্যাপারটি হয়ত সম্পূর্ণ ই সাংবাদিক সুলভ রসিকতা। কিন্তু সে' দিনের "চোখ গেল, চোখ গেল" প্রলাপ মিথ্যা নয়।

পিগটের দুর্ঘটনা জনিত চোটের পর কটা চোখে অভিলাষ মানুষ নয়—"কালো দৈত্য।" ইংরাজ প্রভুদের দেয়া নাম। "রায় সাহেব, রায় বাহাদুর" ইত্যাদি খেতাবের মত আজীবন লেগে রইল অভিলাষের গায়ে। উত্তর চল্লিশ বয়সে তিনি ব্রুক বণ্ড কোম্পানীর একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা। তখনও তাঁকে পথে ঘাটে দেখলে সকলে সসম্ভ্রমে বলত, "ঐ যে ১৯১১ সালের কালো দৈত্য যাচ্ছেন।"

মোটেই কিন্তু দৈত্যসুলভ চেহারা ছিল না অভিলাষের। নিকষ কালো ছিলেন বটে। নাতিদীর্ঘ লোকটির চোখে মুখে কিন্তু ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব শ্যামলতার কোমল প্রলেপ। "কালো দৈত্য" নয়; অভিলাষ বরং ছিলেন বাংলার ঘরোয়া কালো মানিক।

তাকে ঐ ভাবে চিহ্নিত করেও সাহেবদের গায়ের জ্বালা মিটল না। মোহনবাগানের হাতে সেমি-ফাইন্যালে মিডল্‌সেক্‌স দলের তিন গোলে পরাজয়কে তারা সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারল না। আত্ম-প্রবঞ্চনার চোরা বালিতে উটপাখীর মত মাথা গুজল।

পরিষ্কার তিন গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হল মোহনবাগান। বিরুদ্ধে একটি গোলও নেই। মাঠে জয়লাভের মধ্যে ভারতীয় দর্শকেরা যেমন কেবল সাহেবদের হার দেখেছিল তেমনই সাহেবরাও এ' শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে দেখলেন 'গেল রাজ্য, গেল মান'। তাই সাহেবরা তখন বলাবলি করছে যে পিগটের চোখে নখের চোট না লাগলে বাঙ্গালী

দল সেদিন বিজয়ী হত না। অথচ সমসাময়িক সমস্ত সংবাদপত্রই বলেছিলেন যে এত অধিক গোলের ব্যবধানে না হলেও মোহনবাগান সেদিন বিজয়ী হতই। নিঃসন্দেহে তারা ছিল যোগ্যতর দল।

পুরাণো নথিপত্রের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে আমরা আগেই দেখেছি যে মোহনবাগানের বিজয়ী হওয়া উচিত ছিল প্রথম সংঘর্ষেই। পিগটের চোখে লেগেছিল ফিরতি খেলাতে। প্রথম দিন তিনি দুটি চোখ নিয়েই বহাল তবিয়তে গোল রক্ষা করেছিলেন। সেদিনও মোহনবাগান তার বিরুদ্ধে একটি গোল করেছিল।

পয়ষট্টি বছর পূর্বের সংবাদপত্রগুলি সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে প্রথম দিনের খেলাতে মোহনবাগানের ঘাড়ে চাপান হয়েছিল হয়েছে-কি-হয়-নি গোছের একটি বিতর্কমূলক গোল। সেই বোঝা মাথাতে করেও মোহনবাগান শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পরিশোধমূলক গোলটি করেছিল। দু' চোখওয়ালা পিগটও পারে নি তাদের ঠেকাতে!

তবু অভিলাষের উপর তাদের রাগ। অথচ অভিলাষের কি অপরাধ? নরম মাঠে পা হড়কে পড়ে গেলেন তিনি। পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিগট চোট পেলেন চোখে। অনেকের অভিলাষ পূর্ণ হলেও অভিলাষের কিন্তু সত্যই পিগটকে আঘাত করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। সম্পূর্ণ দুর্ঘটনার বলি হয়েছিলেন পিগট।

ইঙ্গ সমাজের কিন্তু অন্য ধারণা। মুখে খুলে না বললেও তারা তখন মনে করছে যে মোহনবাগান ইচ্ছা করেই এ' বদলা নিয়েছে। হীরালালকে মিডল্‌সেক্‌সের খেলোয়াড়েরা ঠেলে গোলে ঢুকিয়েছিল প্রথম দিন। সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয় দিন অভিলাষ তার শোধ নিলেন।

পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পূর্বতন অন্যায়ের কথা স্মরণ করে "তদা নাশংসে বিজয়ায়" বলে বিলাপ করেছিলেন। সাহেবদেরও এখন প্রায় সেই অবস্থা। অভিলাষকে তখন সাহেবরা মনে মনে সমীহ করতে আরম্ভ করেছে।

তারা জানে ইষ্ট ইয়র্কস দলও তাদের গোলরক্ষক ক্রেসির উপর বিশেষ নির্ভরশীল। পিগটের ন্যায় ক্রেসিও ছিলেন অসামান্য দক্ষ গোল-রক্ষক। এ' বছরেরই অন্য সেমি-ফাইন্যাল খেলাটিতে ক্রেসিই ক্যালকাটা দলের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই খেলাতে রেফারী পুলার খেলোয়াড় হিসাবে ক্যালকাটা দলকে সাহায্য করেছিলেন। সে' খেলা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "এ'মরসুমে সব কয়টি সৈনিক দলকেই আমরা হারিয়েছিলাম ; লীগে আমরা একটানা সাতটি খেলাতে জিতেছিলাম। ভেবেছিলাম যে সেমি-ফাইন্যালে ইষ্ট ইয়র্কস দলের বিরুদ্ধে আমরা সহজেই মোকাবিলা করতে পারব। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে খেলাতে ক্রেসি হয়ে উঠলেন অজেয়। সৈনিক দলের গোলে আমরা অনবরত বোমাবর্ষণ করলাম কিন্তু ক্রেসি একবারও পরাজিত হলেন না।"

এ' হেন ক্রেসিই এখন ইঙ্গ সমাজের শেষ আশা ও ভরসা। এখন আর মোহনবাগানকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাঁদের লোভী হাত শীল্ডের বড় নিকটে এসে গেছে। এখন যম রাজকে ঠেকাবার মত একমাত্র কবিরাজ হলেন ক্রেসি।

তাই ক্রেসির জন্য তাদের এত দরদ ; তার চোখ সম্বন্ধে এত আশংকা। তাই এই 'নখ কাটো' প্রলাপ !

প্রলাপ বকছে মোহনবাগান দলের সমর্থকেরাও। তারাও এখন স্বপ্ন সার্থক হবে এ' আশাতে মশগুল। তারা আগেই বলেছিল যে রাইফেল ব্রিগেডের গাঁট পেরোলে মোহনবাগানের ভাগ্যে একাদশ বৃহস্পতির আবির্ভাব হবে। তাদের মনে এখন আর কোন দ্বিধা নেই। জনসাধারণের চোখে ইতিমধ্যেই মোহনবাগানের সৌভাগ্য সূর্য উঠেছে মধ্যাহ্ন গগনে। তাই এখন গরম ছাড়া নরম কথা আর নেই।

এমনই তীব্র উত্তেজনাময় মানসিক পরিস্থিতির পশ্চাদপটে ইষ্ট ইয়র্কস এবং মোহনবাগান পরম সম্মানের জন্য চরম সংগ্রামে পরস্পরের সম্মুখীন হল।

দু'দিক থেকে উঠেছে দুই দল। অগ্রগতির পথে উভয় দলই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর পতন ঘটিয়েছে। কারো থেকে কেউ কম নয়।

ফাইন্যালের পথে ইষ্ট ইয়র্কস হারিয়েছে ঃ

রয়েল স্কটকে ০-০, ৩-২, ২-০ * (*প্রতিবাদের পর খেলা)

মোসলেমকে ৭-০, এবং

ক্যালকাটাকে ১-০ ;

চরম পর্যায়ে পৌঁছুতে মোহনবাগান পরাজিত করেছে ঃ

সেণ্ট জেভিয়ার্সকে ৩-০,

রেঞ্জার্সকে ২-১,

রাইফেল ব্রিগেডকে ১-০, এবং

১ম মিডল্‌সেকসকে ১-১, ৩-০ ;

দেখা যাচ্ছে পাঁচটি খেলাতে ইষ্ট ইয়র্কস গোল করেছে ১৩টি, তাদের বিরুদ্ধে হয়েছে মাত্র দুটি গোল। প্রথম খেলাতেই রয়েল স্কট তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। রয়েল স্কট বিশেষ শক্তিশালী দল ছিল। তাদেরই শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা সমধিক বলে সূচনাতে সমালোচকদের ধারণা ছিল। কিন্তু জিতল ইষ্ট ইয়র্কস এবং তখনই সাধারণের চোখে তারা হল বাজিমাৎ করার ঘোড়া।

মোহনবাগানের স্বপক্ষে ছয়টি খেলাতে হয়েছিল ১০টি গোল এবং তাদের বিরুদ্ধেও দুটি মাত্র গোল। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে 'বাবু' দলকে কেউ পাত্তেই তোলে নি। মোহনবাগান নামাঙ্কিত হল রাইফেল ব্রিগেডকে হারিয়ে। তারপর অবশ্য মোহনবাগান নাড়াও দিল, সাড়াও জাগাল।

সেদিন কিন্তু এ' পরিসংখ্যান নিয়ে কোন আলোচনা বা তুলনামূলক সমালোচনা হয় নি। আজ দীর্ঘ পয়ষট্টি বছরের ব্যবধানে উপরোক্ত খতিয়ান বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে দুটি দলই ছিল প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন। মোহনবাগানের ১০টি গোলের স্থলে ইষ্ট ইয়র্কসের ১৩টি

গোল। কিন্তু এ' সংখ্যা স্ফীত হয়েছে মোসলেম দলের বিরুদ্ধে করা ৭টি গোলে। সে' খেলাটি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে মোহনবাগানের আক্রমণই হয়ত অপেক্ষাকৃত তীব্রতর। রক্ষণ বিভাগ দু' দলেরই সমান সুদৃঢ়। তবে সৈনিক দলের গোলে আছে ক্রেসি।

দু'দলের মধ্যে জবর লড়াই এর আশা নিতান্ত অবাস্তব ছিল না। ইষ্ট ইয়র্কস তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলবে এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। পচা শামুক মোহনবাগানকে নিয়েই যা কিছু জল্পনা কল্পনা। তবে, আই, এফ, এ শীল্ডের উনিশ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে ইতিপূর্বে যা কখনও ঘটেনি এবার তাই ঘটেছে। শেষ পর্যায়ে উঠেছে একটি ভারতীয় দল—মোহনবাগান। তারা যে জান লড়িয়ে খেলবে এ সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন সন্দেহ নেই।

সেই সুদূর অতীতে সংবাদপত্রে খেলাধূলার স্থান বর্তমান কালের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৯১১ সালের কোন সংবাদপত্রেই এ' অভূতপূর্ব শীল্ড ফাইন্যালের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে কোন আলোচনাই নেই। অমৃতবাজার (২৯. ৭. ১১) কেবল জানিয়েছিলেন যে এ' দিনের আই, এফ, এ শীল্ড ফাইন্যালে মিঃ ফ্রাঙ্ক কার্টার সভাপতিত্ব করবেন এবং পুরস্কার বিতরণ করবেন মিসেস্ ওয়াটসন।

সভার চেয়ে সেদিন বড় ছিল সভাপতি।

ষ্টেট্সম্যান, ইংলিশম্যান ইত্যাদি কাগজ সেদিন আগ বাড়িয়ে শীল্ড ফাইন্যাল নিয়ে একটি কথাও বলেন নি। পণ্ডিতেরা এখন আর মুখ খুলতে নারাজ। প্রতিযোগিতার সূচনার পূর্বে তারা বলেছিলেন যে শীল্ড এবার বাইরেই যাবে এবং দৈবাৎ ঘরে যদি থাকে তবে ক্যালকাটা দলই তা' রাখবে। সুতরাং, এখন যে পরিস্থিতি তাতে শীল্ড বাইরেই যাক এই তাদের বাসনা। কিন্তু সে' কথা বলতেও সাহস পাচ্ছেন না।

তারা মোহনবাগানের প্রশস্তি গাইবেন, 'বাবু' দলের সাফল্য কামনা করবেন, এমন আশা কেউ করে নি। কিন্তু এ' দিনের ফাইন্যাল খেলাটি হচ্ছে একটি বহিরাগত ও একটি স্থানীয় দলের মধ্যে। কলিকাতা ফুটবলের সম্মান রক্ষার খাতিরেও স্থানীয় বাঙ্গালী দল তাদের শুষ্ক সমর্থন পাবে এ' আশাও কি সে' দিন খুব অসঙ্গত ছিল?

কিন্তু বিস্মৃত হলে চলবে না যে স্থানীয় দল 'বাবু' মোহনবাগান। শেষ পর্যন্ত তারাই যদি কলিকাতার ফুটবল সম্মান রক্ষা করে তবে অসম্মানের আর কি বাকী রইল?

তবু একটি সংবাদ শুনে অতি আধুনিক পাঠকেরও হয়ত একটু চমক লাগবে। খেলাধূলার সেই অন্ধকার যুগেও এ' অনন্যপূর্ব শীল্ড ফাইন্যালকে বিষয় বস্তু করে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে এ' সংবাদ পত্রের ফাইলে সেই ক্রোড়পত্রটি নেই। অনেক অনুসন্ধান করেও আমি সেই ক্রোড়পত্রের একটি কপিও সংগ্রহ করতে পারিনি।

পারব কি করে? বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিশেষ পথেই ক্রীড়ারসিকেরা তা' হস্তগত করেছিলেন। ২৮শে জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজই সংবাদ দিলেন, "আমাদের নিয়মিত পাঠকেরা কাল ফুটবলের বিশেষ ক্রোড়পত্র পান নি জেনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। চতুর দপ্তরী, দরোয়ান এবং বেয়ারারা সেই ক্রোড়পত্র খুলে নিয়ে বাজারে বিক্রয় করেছে। আমাদের কাগজের দাম দু' পয়সা মাত্র, কিন্তু সেই ক্রোড়পত্র কাল বিক্রী হয়েছে চার আনাতে।"

ইঙ্গ সমাজের মুখপাত্ররা যাই ভাবুন আর তাই ভাবুন, এমন গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে নগ্নপদ ভারতীয় দলকে এক চোখ সব সময়েই আকাশের দিকে রাখতে হয়। একে জীবনের প্রথম আই, এফ, শীল্ড ফাইন্যাল; তার উপর অগণিত সমর্থকবৃন্দের গভীর আস্থার সম্মান রক্ষা করার কথাও

তারা ভুলতে পারে না। স্নায়ুর চাপে খেলোয়াড়দের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এমন খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি সৈনিক দল। ভরা বাদরেও তাই চাই নিদাঘ-তপ্ত দিন। সুতরাং, ২৯শে জুলাই ভোর বেলাতে সকলেরই সব কাজ ফেলে আবহাওয়ার সংবাদের সন্ধান।

ভরা শ্রাবণ হলেও সেদিন আবহাওয়ার সংবাদ ছিল আশাপ্রদ। খেলার সঙ্গে আবহাওয়ার সম্বন্ধের কথা হয়ত তাদের মনেই হয় নি, কিন্তু মধুর সংবাদ দিলেন অমৃতবাজার। (২৯. ৭ ১১) জানালেন, "গত বুধবার কলিকাতার অদূর পশ্চিমে যে নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়েছিল তা' এখন লোপ পেয়েছে। মৌসুমি বায়ু এখন বড়ই দুর্বল। স্থানীয় আবহাওয়া বিশেষজ্ঞগণ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছেন না।"

সর্ব রক্ষা!

জয় মা দুর্গা! জয় মা কালী, কলকাত্তাওয়ালী!

বৃষ্টি হল না ফাইন্যালের দিন। উলটে হল প্রচণ্ড গরম আর গুমোট। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (৩১. ৭ ১১) বলেছিলেন, "মাঠের অবস্থা ছিল চমৎকার। গরমে দর্শকদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল। কুড়ি পংক্তি গভীর হয়ে দণ্ডায়মান দর্শকদের অবস্থা বলার চাইতে অনুমান করাই ছিল সহজ।"

আজও যেমন, সেদিনও তেমন। খেলা হলেই "টিকিট, টিকিট।" সবাই টিকিট চায় কিন্তু দিতে কেহ নাই।

তখন অবশ্য টিকিটের চাহিদা সমাজের সর্বস্তরে এমন ব্যাপক ছিল না। সর্ব সাকুল্যে টিকিট থাকত মাত্র হাজার দুই কি তিন। কাজেই টিকিট দুর্ভিক্ষের তীব্রতা কিছু কম ছিল না। মাঠও তখন ঘেরাও করা ছিল না। সাহেব সুবোদের জন্য কিছু গ্যালারি থাকত বটে। তাতে

স্যুট-বুট পরা দু'একজন ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকও মাঝে মাঝে দেখা যেত। তারাই "টিকিট, টিকিট" বলে টিক টিক করতেন।

চ্যারিটি খেলা হলে সে' গ্যালারি এবং মাঠের সার্বিক বন্দোবস্তের ভার তখন থাকত মেসার্স টি, ই, বিভানের হাতে। তারা ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে (২৯. ৭. ১১) বিজ্ঞাপন দিয়ে জানালেন, "শুরুতে যে আসনের বন্দোবস্ত ছিল তার সবগুলিই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার মধ্যেই বিক্রী হয়ে গেছে।"

অর্থাৎ খেলার দু'দিন আগেই টিকিট খতম। খেলা ছিল শনিবার।

"তারপর আই, এফ, এর সৌজন্যে" জানালেন মেসার্স টি, ই, বিভান কোম্পানী, "পশ্চিমের গ্যালারিতে আরো ২০০ এবং পূব দিকে আরো এক হাজার আসনের বন্দোবস্ত করেছিলাম। তাও সব বিক্রী হয়ে গিয়েছে শুক্রবার দুপুর বেলাতেই। এখন কেবল উত্তর দিকে অল্প কিছু আসন পাওয়া যেতে পারে।"

নিকুচি করেছে বিভান কোম্পানীর এবং আসর সাজান আসনের।

মাঠে এসেছে কম করেও আশী হাজার লোক। মাঠের ভিতরে যত, বাইরে তার দশ গুণ লোক। তারা বসতে চায় না। তারা কেবল দেখতে চায় মোহনবাগানকে। তারা দেখতে চায় সাহেবদের পরাজয়। তারা দেখতে চায় বাঙ্গালী দলের জয়লাভ। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে মাঠে একটু স্থান পেলেই তারা খুশী। যেখানেই হোক দাঁড়ালেই চলবে তাদের। নিদেন কয়েক গণ্ডা পয়সা দিয়ে বকের মত এক পায়ে টুল, টেবিল বা বাক্সের উপর দাঁড়াবে।

কিন্তু ভাল করে যে খেলা দেখতে পাবে না তারা! কালা আদমি যে বঞ্চিত ১৯১১ সালে এ' কথা তাদের অজানা নয়। কোন কিছুই, এমন কি খেলাও, তারা ভাল করে দেখতে পাবে না। খেলা দেখতে নাই বা পেল তারা; দূর থেকেই মন দিয়ে তারা মোহনবাগানকে ছোঁবে। সামিল হবে মোহনবাগানের।

গোলের কথা তবু জানা চাই। কেমন করে গোল হয়েছে, কে গোল করেছে এ' সব না জানলেও চলবে। কিন্তু গোল হল কি না জানতেই হবে। অবশ্য "মোহনবাগান গর্জনে" সে' সংবাদ ঘোষিত হবেই। তবু অন্য ভাবেও জানা চাই। কি করে এ' অসম্ভব সম্ভব হবে?

কেন, ঘুড়ি উড়িয়ে। কালো ঘুড়ি উঠলে—সর্বনাশ! লাল সবুজ ঘুড়ি উড়লে—সাবাস! নেটিভের মাথা—কঠিন সমস্যার কি সহজ সমাধান।

ক্যালকাটা মাঠে লোকে লোকারণ্য। ময়দান পরিণত হয়েছে জন-সমুদ্রে।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (৩১. ৭. ১১) লিখলেন, "শনিবার বেলা ১১টাতেই মাঠে দশ হাজার লোক। বিকাল পাঁচটাতে কম করেও ষাট হাজার। একটি বাঙ্গালী দল সামরিক ও বে-সামরিক সাহেব দলকে খেলার পর খেলাতে হারিয়ে শীল্ড জিতবে এ' কথা দুদিন আগেও কেউ ভাবতে পারে নি। আজ কিন্তু তা' চরম ও পরম সত্য।"

আরো যোগ করলেন এই সংবাদপত্র, "দশটি বসন্তের বালক থেকে আরম্ভ করে আশীটি শীতের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই স্থান করে নিয়েছে এই ভীড়ে। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে গত কয়েক দিন ধরেই তুমুল উৎসাহ ও তীব্র উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়েছে। জীবনে ফুটবল দেখে নি এমন বহু লোক আজ যশোমণ্ডিত মোহনবাগানের অতুলনীয় কীর্তির সাক্ষী হতে মাঠে এসেছিল।"

ষ্টেট্‌সম্যান (১. ৮. ১১) বলেছিলেন, "শীল্ডের কোন ফাইন্যাল খেলাতেই ইতিপূর্বে এমন উত্তেজনা আর কখনও দেখা যায় নি। কত লোক হয়েছিল তার অনুমান অসম্ভব।"

নেটিভ জনতার প্রতি দেখছি এখন ইংলিশম্যানেরও রাগের বদলে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে। ফাইন্যাল খেলাতে অভূতপূর্ব জন-সমাবেশ সম্পর্কে ইংলিশম্যান (৩১. ৭. ১১) সম্পাদকীয় মন্তব্য করলেন, "বাঙ্গালী

কলিকাতা শনিবার মোহনবাগান বনাম ইষ্ট ইয়র্কস খেলা সম্বন্ধে যে অসামান্য উৎসাহ প্রকাশ করেছে তাতে বিস্মিত বোধ না করে উপায় নেই। শূন্য গাড়ীর লাইন প্রসারিত হয়েছিল একদিকে হাইকোর্ট এবং অন্য দিকে ষ্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত। ষ্ট্রাণ্ডে তিন পংক্তি গভীর হয়ে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল এবং ক্যালকাটা মাঠের অন্য দু'দিকে গাড়ীর উপর গাড়ী জমে বিরাট স্তূপের সৃষ্টি হয়েছিল।"

"গাছে মানুষ ধরে না। হাজার হাজার লোক জনতার সঙ্গে মিশে ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। গাছের লোকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আনন্দে চীৎকার করছে নীচের লোক। মাঠের ভিতরের লোক ঘুড়ি উড়িয়ে খেলা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখছে বাইরের লোককে। দ্বিতীয়বার মোহনবাগানের ঘুড়ি আকাশে উঠলে জনতা মাতাল হয়ে গেল।"

আর গণেন মল্লিক লিখলেন অমৃতবাজারে, "বেলা-ভূমির বালুকণা কি গণনা করা যায়? এ' জনতার পরিমাণও অনুমান করেই নিতে হবে। হতে পারে আশী হাজার, হতে পারে আরো বেশী। হাওড়া এবং বর্ধমানের মধ্যে চলেছে একটি বিশেষ ট্রেন।" (বোধ হয় বর্তমান কালের তীর্থযাত্রী স্পেশালের পূর্ব সূরী।) "জাহাজে করেও এসেছিল অনেক লোক। আর আমি নিজে জানি, পাটনা থেকে এক ফুটবল প্রেমিক এসেছেন এ' খেলা দেখতে।"

খেলা নয়, এ' ছিল প্রকৃতই এক মহামেলা। শীল্ড জয়ের অনেক পূর্বেই মোহনবাগান বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়ে বসেছে। একটির পর একটি সাহেব দলকে হারিয়েছে, আর দিনে দিনে মোহনবাগান হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীর প্রাণের আরাম, আত্মার আত্মীয়।

এ' পরিস্থিতিতে বিভান কোম্পানীর আসনের আশ্বাস ব্যর্থ পরিহাস মাত্র। তবে পয়সা কামিয়েছিল বটে টুল ও টেবিলওয়ালারা এবং ফেরিওয়ালারা। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ সংবাদ দিয়েছিলেন, "ময়দানে সেদিন (১৯১১ সালে!) ছোট্ট একটি সিদ্ধ আলুর দাম এক

পয়সা, পান একটি এক আনা। বাক্স ও টুলের উপর দাঁড়াবার জন্য সকালের দিকে লোকে দিয়েছে আট আনা এবং খেলার এক ঘণ্টা আগে—দু'টাকা।”

ভাবছেন, এ' সমাজে মুনাফা শিকারী কবে ছিল না?

* * *

খেলা দেখে সকলেই কিন্তু সব কষ্ট, সব ক্ষতি ভুলে গেল।

চমৎকার পরিবেশে হল অপূর্ব পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা। নীল আকাশের নীচে ক্যালকাটা মাঠের সবুজ ঘাসের গালিচা। রোদে ঝলমল করছে। প্রচণ্ড গুমোট, কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই নেই। আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষ অঙ্কের উপযুক্ত নাট্য-মঞ্চ।

মাঠে নামল দু'দল। 'মোহনবাগান গর্জনে' অভ্যর্থিত হল জনতার দুলালরা। সৈনিক দর্শকও মাঠে ছিল প্রচুর। সাহেবরা এবং সৈনিকরা হইচই করে স্বাগত জানাল ইষ্ট ইয়র্কস দলকে। ভারতীয় দর্শকদের মনে কিন্তু এ' খেলার রেফারী কে হবে তা' নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা আছে। মাঠে নামলেন পুলার; জনতা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

টসে জিতলেন জ্যাক্সন। তিনি কেল্লার দিকের মাঠে ব্যূহ রচনা করলেন। ইডেন উদ্যানের দিক থেকে মোহনবাগান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল।

খেলা শুরু হল। মাঠে নেমে এল নীরবতা।

খেলা সম্পর্কে লিখলেন ষ্টেট্সম্যান, (৩১.৭.১১) “ইতিপূর্বে এমন উত্তেজনা শীল্ডের আর কোন ফাইন্যাল খেলাতেই দেখা যায় নি। লোক কত হয়েছিল তার অনুমান অসম্ভব। খেলাটিতে আগাগোড়া মরণপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং খেলার গতিও ছিল অবিশ্বাস্য প্রকারের ক্ষিপ্র। তুলনামূলক বিচারে উভয় দলই প্রায় সমান সমান খেলেছে। তবু, যোগ্যতর দল হিসাবেই জয়লাভ করেছে মোহনবাগান।”

আরো বললেন ষ্টেট্‌সম্যান, "সৈনিক দলকে স্বীকার করতেই হল যে তাদের মধ্যে শিবদাস ভাত্নড়ীর সমকক্ষ খেলোয়াড় কেউ নেই। অতুলনীয় এবং মনোমুগ্ধকর ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন এদিন মোহনবাগান দলের প্রতিভাধর অধিনায়ক। এ' খেলাতে জয়লাভের জন্য মোহনবাগান প্রধানতঃ শিবদাসের চমকপ্রদ ক্রীড়া নৈপুণ্যের নিকট ঋণী।"

এদিন শিবদাসের খেলা যেমন নজর-কাড়া হয়েছিল তেমনই হয়েছিল প্রতিভাদীপ্ত। প্রত্যেকটি খেলাতেই শিবদাস তার অপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ভেলকি দেখিয়েছিলেন তিনি মিডল্‌-সেকস্‌ দলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতে। সেদিন বুদ্ধিদীপ্ত ক্রীড়াকৌশলে তিনি সৈনিক দলের মরণ-ফাঁদ পেতেছিলেন। কিন্তু শেষ আসরে তিনি যে গান গেয়ে গেলেন তার আর তুলনা নেই। খেলছেন বাম পার্শ্বে, কিন্তু মোহনবাগানের সমস্ত আক্রমণ পরিকল্পনার উৎস রূপে প্রতিভাত হয়েছেন শিবদাস।

দর্শকগণ চোখ ভরে দেখল তার খেলা, প্রাণ ভরে উপভোগ করল।

বলের সঙ্গে যেন তার পায়ের মিতালি। যা' খুশী তাই করে যাচ্ছেন। সর্পিল গতিতে নাচের ছন্দ তুলে অবহেলাতে অতিক্রম করে যাচ্ছেন দু'তিন জনকে। বল দিচ্ছেন একে তাকে এবং এগিয়ে গিয়ে আবার বল ফেরৎ নিচ্ছেন। নরম মাখনের তালের মধ্য দিয়ে ছুরির গতির মত অনায়াসে তিনি ফাটল সৃষ্টি করেছেন সৈনিক দলের রক্ষণ বিভাগে। নিজে খেলেছেন, খেলিয়েছেন আর সকলকে। তার যাদুর স্পর্শে এদিন অপূর্ব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল মোহনবাগানের আক্রমণ বিভাগ। দর্শকদের আনন্দের আর সীমা নেই।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের (৩১.৭.১১) বর্ণনাতেও ফুটে উঠেছিল সে' একই ছবি। "খেলা দেখে ভারতীয় দর্শকদের বুক গর্বে ভরে উঠেছে। মরণপণ সংগ্রাম বটে। কেউ ছেড়ে কথা কইছে না," লিখলেন এই

সংবাদপত্র। "কিন্তু উভয় দলেরই পরিষ্কার এবং পরিছন্ন খেলা। সব চেয়ে হৃদয়গ্রাহী ছিল মোহনবাগান দলের সম্মিলিত আক্রমণের ক্ষিপ্রতা এবং শিবদাসের চমকপ্রদ ব্যক্তিগত চাতুর্য। প্রতিযোগিতার কঠিনতর দিক দিয়ে রেঞ্জার্স, রাইফেল ব্রিগেড এবং মিডল্‌সেক্‌সকে হারিয়ে মোহনবাগান উঠেছে ফাইন্যালে এবং চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে উপযুক্ত দল হিসাবেই জয়লাভ করেছে।"

এ' সংবাদপত্র আরো বললেন, "সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি এদিন আকর্ষণ করেছিলেন শিবদাস, বিজয়দাস, জে, রায়, সুকুল সেনগুপ্ত এবং হীরালাল। বল নিয়ে এঁকে বেঁকে একক কৃতিত্বে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে শিবদাসের সমতুল্য মাঠে আর কেউ ছিল না। জে, রায় ও তার অসামান্য ক্ষিপ্র গতির সাহায্যে অনেকবার সৈনিক দলের উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিলেন।"

"ব্যাকে সুকুল এবং সেণ্টার-হাফে রাজেন সেনগুপ্ত চমৎকার দৃঢ়তা এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ' দুজন বারবার যেমন প্রতিপক্ষের পথরোধ করেছেন তেমনই অনবরত বল জুগিয়েছেন নিজ পুরোভাগের খেলোয়াড়গণকে। সৈনিক দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় ভাবে খেলেছিলেন সেণ্টার হাফ জ্যাক্‌সন, দুই আউট বার্চ ও ক্লুকাস এবং আক্রমণের নেতা হেউড।"

উপসংহারে ডেইলি নিউজ মন্তব্য করলেন, "বহু কৃতী খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত চাতুর্যে মোহনবাগানের খেলা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু আমাদের মনে হয়েছে যে দলের মধ্যে অসামান্য সমঝোতা এবং অপূর্ব পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধই মোহনবাগানের এমন সাফল্যের মূল কারণ। বহু অংশ বিশিষ্ট কিন্তু তৈল-সিক্ত একটি যন্ত্রদানব বিশাল শক্তি নিয়েও যেমন মসৃণভাবে চলে তেমনিভাবেই এদিন খেলেছিল মোহনবাগান।"

বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মতামতের আলোচনা শেষ হল। এবার আমাদের একান্ত আপনার লোক গণেন মল্লিকের কথা।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের মতের সমর্থনই প্রথমে শোনা গেল গণেন মল্লিকের বক্তব্যে। সূচনাতেই তিনি বলছেন, "এদিন মোহনবাগান দলগত সজ্ঘবদ্ধতা এবং বোঝাপড়ার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তা' আগামী বহু দিন লোকের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা নিশ্চয়ই এ' খেলার কথা আজীবন মনে রেখেছিলেন। কিন্তু তারা এবং গণেন মল্লিক নিজেও বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নি যে সেই খেলার রেশ অনাগত ভবিষ্যতেও লেগে থাকবে ফুটবল প্রেমিকদের মনে।

সমালোচক হিসাবে গণেন মল্লিক বোধ হয় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী ছিলেন। ভাবালুতার প্রশ্রয় না দিয়ে তথ্য-ভিত্তিক সমালোচনা এবং যুক্তি-গ্রাহ্য অনুমানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রাইফেল ব্রিগেড দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় পর্যায়ের খেলার পরই তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে এবারের প্রতিযোগিতাতে মোহনবাগান ফাইন্যালে উঠলেও আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।

কেউ তখনও মোহনবাগানকে কলকে দিচ্ছে না। তখনই সমালোচনার কষ্টিপাথরে নির্ভুল যাচাই করে ফাইন্যালে মোহনবাগানের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি রয়েল স্কট বনাম ইষ্ট ইয়র্কস খেলার বিজয়ী দলকে চিহ্নিত করেছিলেন। তার সমালোচনা সঠিক এবং নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মোহনবাগান ফাইন্যালেও উঠেছে এবং শেষ খেলাতে হারিয়েছে সেই ইষ্ট ইয়র্কসকে।

যাদের এ' খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা ভাগ্যবান। তারা যা দেখেছিলেন—সেই অসামান্য জন-সমাগম, সেই সামাজিক পরিস্থিতি, সেই মুখর উত্তেজনা, সেই পলাশীর পর প্রথম জয়ের আস্বাদন, সেই

জন-সাধারণের জাতীয় সম্মান বোধের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস—তা' আজও কালজয়ী হয়ে এবং মধুর স্মৃতি হয়ে লেগে আছে মনে।

সেদিনের সব ঘটনাই এখনও আবদ্ধ হয়ে আছে সংবাদপত্রের নীরস পাতাতে। বর্তমানের ফুটবল রসিক চাক্ষুষ এ' রস উপভোগের সুযোগ কখনও পাবেন না। অতীতের ছায়াকে তুলে ধরা যেতে পারে কিন্তু অতীত কখনও কায়া ধারণ করে না। কিন্তু সেদিনের সদ্য জয়লাভের আনন্দে উদ্বুদ্ধ লেখনীতে যে তথ্য ও সত্য উদঘাটিত হয়েছে তাও বর্তমান যুগে পরম প্রাপ্য বলেই মনে হবে।

তাই ফিরে যাই আবার গণেন মল্লিকের কাছে।

"এমন উদ্দীপনাপূর্ণ খেলা, এমন প্রীতিপ্রদ ক্রীড়ানৈপুণ্য, এমন ক্ষিপ্র গতি এমন পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা," বলছেন গণেন মল্লিক, "ইতিপূর্বে শীল্ডের কোন ফাইন্যাল খেলাতে আর দেখা যায় নি। মোহনবাগানের প্রাধান্য ছিল পরিস্ফুট, প্রায় দৃশ্যমান। তাদের খেলার রীতি ও কৌশল এমন সুন্দর হয়েছিল যে ইষ্ট ইয়র্কস খেলাতে কোন সময়েই তেমন কোন সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে নি।"

অমৃতবাজার পত্রিকাতে তার সমালোচনার উপসংহারে গণেন মল্লিক লিখলেন, "এদিন ভাদুড়ী ভাইদের মধ্যে হয়েছিল মণি-কাঞ্চন যোগ এবং তারা প্রত্যাশিত সমর্থনও পেয়েছিলেন নীলমাধব এবং মনোমোহনের কাছ থেকে। পায়ের সূক্ষ্ম কাজে শিবদাস ছিলেন অতুলনীয়, কিন্তু হাবুল এবং অভিলাষও এদিন ব্যক্তিগত চাতুর্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। লক্ষাধিক দর্শক যেন এদিন ব্রজের রাখাল; তাদের মুখে কেবল "কানু, কানু" ধ্বনি। যেন কানু বিনে আর গীত নেই। ডান পার্শ্বে কিবা তার ভঙ্গী, কিবা তার বিদ্যুৎ গতি। সেদিন ক্রেসি এমন প্রশংসনীয় ভাবে গোল রক্ষা না করলে সৈনিক দল হয়ত আরো অধিকতর ব্যবধানে পরাজিত হত।"

বটে! এ' যেন একটু বেশী বেশী বলা হচ্ছে। অবশ্য, সব সংবাদ-

পত্রই এক বাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে যোগ্যতর দল হিসাবেই সেদিন মোহনবাগান জয়মাল্য কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু একজন ছিলেন ব্যতিক্রম।

১৯১১ সালে কিন্তু তিনি তার মুখ বন্ধ করেই ছিলেন। তখন তার কথা শোনা যায় নি। তারপর অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় বিলাতে বসে তিনি মনের দুঃখে গুমড়ে মরছিলেন। খেলার পঞ্চাশ বছর পর তিনি বললেন, "বোধ হয় সেদিন আমার ক্রটির জন্যই মোহনবাগানের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল।" অর্থাৎ মোহনবাগান সেদিন বিজয়ী হয়েছিল যোগ্যতার জোরে নয়, তার দাক্ষিণ্যে।

এমন কথা বলার হক অবশ্য তার আছে। সেদিনের খেলাতে তিনিই ছিলেন রেফারী। খেলা পরিচালনার ভার ছিল এই ব্যতিক্রম ব্যক্তিটির উপর। ষাটের দশকে সেই খেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তার মনে সন্দেহ জেগেছে যে সেদিন বোধহয় তিনি বাঁশিতে একবার ভুল সুর বাজিয়েছিলেন। সেই ভুল না হলে খেলার ফলাফল নাকি অন্য রকম হত।

খেলাতে এক গোলে পিছিয়ে আছে মোহনবাগান। তখনই হল বংশীধারীর সেই মারাত্মক ভুল। সেই ছিদ্রপথে অব্যাহতি পেয়ে মোহনবাগান দিল মরণ কামড়। পরাজয় ঘটাল ইষ্ট ইয়র্কসের।

রেফারী ছিলেন মিঃ পুলার। ষাটের দশকে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "এক গোলে এগিয়ে আছে ইষ্ট ইয়র্কস। তখনই আমার সেই মারাত্মক ভুল হল। সৈনিক দল তখন মাঠের ডানদিকে একটি আক্রমণ রচনা করে মোহনবাগান গোলের সম্মুখীন হয়েছে। বার্চ গোল লক্ষ্য করে সট করলেন, কিন্তু সেনগুপ্তের গায়ে লেগে সে' বল কর্ণার হল। আমি কর্ণার দিলাম।"

"সৈনিক দল কিন্তু পেনালটি দাবী করেছিল। ক্যালকাটা দলের সভ্যদের পাশ ঘেষে বসা সৈনিক দর্শকেরাও হইচই করে এ' দাবী সমর্থন করেছিল।"

হয়ত সবই সত্য। কিন্তু সমসাময়িক কোন সংবাদপত্রে এ’ সম্বন্ধে কিছু মাত্র উল্লেখও নেই। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনালটি হল, অথচ রেফারী তা’ উপেক্ষা করলেন। এমন অঘটন ঘটলে সেদিনের ইংলিশম্যান, ষ্টেট্সম্যান ইত্যাদি সমালোচনাতে মুখর হবেন না এমন মনে করাও কঠিন। কিন্তু ভুল যিনি করেছিলেন এ’ যে তারই স্বীকারোক্তি। হয়ত পুলারের তখন বাহাত্তুরে ধরেছিল। অসম্ভব নয়, কারণ ১৯১১ সালে পুলার ছিলেন ক্যালকাটা দলের খেলোয়াড়। কম করেও ২৫।২৬ বছর বয়স হবে। ষাটের দশকে তিনি হয়ত স্মৃতি-ভ্রংশ পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ।

পুলার বলছেন, “আমি এতে একটু আশ্চর্য হলাম। কিন্তু কর্ণারের নির্দেশই আমি বজায় রাখলাম। পরে বুঝলাম কি ভুল করেছি! খেলার পর ক্যালকাটা দলের কয়েকজন সভ্য আমাকে বললেন যে রাজেনের তখন, গায়ে নয়, হাতে বল লেগেছিল। তারা নাকি স্পষ্টই তা’ দেখেছিলেন। আমার তখন লাইন্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। প্রাপ্য পেনালটি পেলে সৈনিক দল তখন দুই গোলে অগ্রগামী হয়ে যেত। দু’ দুটি গোলের চাপে মোহনবাগান হয়ত তলিয়েই যেত।”

মহাভারতের একটি প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান মনে পড়ছে।

শৃঙ্গী মুনির শাপে রাজা পরীক্ষিতের সর্প দংশনে মৃত্যু হবে সাত দিনের মধ্যে। ছয় দিন কেটে গেছে, সপ্তম দিনও যায় যায়। সে’ সময়ে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ এসে আশীর্বাদ করে রাজাকে দিলেন একটি বদরি ফল। রাজা পরীক্ষিত ভক্তি ভরে সে ফল রাখলেন নিজ মাথাতে। মারাত্মক ভুল করলেন রাজা। সেই বদরি থেকে বেরোল একটি পোকা এবং সেই পোকা তক্ষক হয়ে দংশন করল পরীক্ষিতকে।

খেলাতে মোহনবাগানের মাথাতে চেপেছে একটি গোল। পিছিয়ে তারা হিমসিম খাচ্ছে। তখনই হল বংশীধারী পুলারের সেই মারাত্মক

ভুল। সেই ছিদ্রপথে অব্যাহতি পেয়ে মোহনবাগান হল তক্ষক এবং মৃত্যুদংশন করল ইষ্ট ইয়র্কসকে।

পুলারের অনুশোচনা হতেই পারে। আহা, বাছা রে! এমন করেই কি স্বজাতিদ্রোহ করতে হয়? খেলার পঞ্চাশ বছর পরেও ধর্মপুত্র পুলার বিলাতে বসে সেদিনের পাপের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। কিন্তু এ' হল ইংরাজ চরিত্র। অকারণ মসী-লিপ্ত করে অপরের গৌরব ম্লান করতে তাদের কোন দ্বিধা নেই।

পুলারের হুল ফোটানোর অপচেষ্টা এখন আর কারো গায়ে লাগবে না, বরং কৌতুকেরই সৃষ্টি করবে। সুতরাং গণেন মল্লিকের তথ্যবহুল সত্য বর্ণনাতেই ফিরে যাওয়া ভাল।

অমৃতবাজার পত্রিকাতে সমালোচনার উপসংহারে গণেন মল্লিক বললেন, "খেলার সূচনাতেই চোখে পড়ল রাজেন এবং সমস্ত খেলার মধ্যে কখনও চোখের আড়াল হল না। প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করছে বুক চিতিয়ে এবং অবিশ্রান্ত বল জুগিয়ে যাচ্ছে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের। সুকুলের লম্বা লম্বা জোরাল সট এবং চ্যাটার্জির অবস্থানমূলক খেলাও ছিল তারিফ করার মত। সকলের শেষে হীরালালের কথা বললেও তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না। গোল-রক্ষক হীরালাল এদিন নির্ভীক ও নির্ভুল খেলা খেলেছিল।"

ইষ্ট ইয়র্কস দলের তারিফেও গণেন মল্লিকের কার্পণ্য নেই। সৈনিক দল সম্বন্ধে তার বক্তব্য সংক্ষেপ হলেও সুন্দর। বলছেন তিনি, "ইষ্ট ইয়র্কস দলের হাফব্যাকের খেলা খুবই ভাল হয়েছিল। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন জ্যাকসন। কিন্তু সৈনিক দলের আক্রমণ বিভাগের খেলা অপেক্ষাকৃত এলোমেলো হয়েছিল। বহুবার সৈনিক দলের মধ্যভাগ মোহনবাগানের আক্রমণ প্রতিরোধ করে পালটা আক্রমণ রচনাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইষ্ট ইয়র্কস দলের ফরোয়ার্ডেরা সে' সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। ক্রেসিক

কৃতিত্ব প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। দু'বার পরাজিত হলেও অনেকবার তিনি সৈনিক দলের দুর্গকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।"

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ফাইন্যাল খেলাটির এবং খেলোয়াড়দের এই হল সামগ্রিক চিত্র। সেই সুদূর অতীতের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তদানীন্তন লেখকদের জবানীতেই বর্তমান যুগের পাঠকদের নিকট এ' চিত্র তুলে ধরেছি। অতীতকে উদ্ধার করেছি অনুমানের উপর নির্ভর করে নয়, তথ্যের ভিত্তিতে।

সমগ্র খেলাটির সমালোচনার পর এখন খেলাটির গতি এবং দল দুটির ভাগ্যের উত্থান পতনের বিবরণ। এখানেও অতীতের লেখকদের লিপিবদ্ধ বিবরণ থেকে বাছাই করে ফুল তুলে আমি মাত্র মালা গেঁথেছি। তবে আমি দুই বিপক্ষ শিবিরের দুই সঞ্জয়ের উপর আস্থা স্থাপন করেছি। মূলতঃ নির্ভর করেছি ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ এবং অমৃতবাজার পত্রিকার উপর।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন বলে বোধ করছি। এক গোলে পশ্চাৎবর্তী হয়ে মোহনবাগান ফাইন্যাল খেলাটিতে বিজয়ী হয়েছিল ২-১ গোলে। ফলাফল থেকে সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে এমন গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে প্রথমে পিছিয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু কোন কাগজেই মোহনবাগানের বিপদকালের দৃঢ়তা নিয়ে কোন আলোচনা নেই।

মোহনবাগান অবশ্য সেমি-ফাইন্যালের প্রথম খেলাতেও এক গোলে পিছিয়ে ছিল। সেদিনও তারা প্রশংসনীয় মনোবলের পরিচয় দিয়ে পিগটের ন্যায় গোলরক্ষকের বিরুদ্ধেও নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। সেদিনই মোহনবাগান প্রমাণ করেছিল যে সঙ্কটকালে উজ্জীবিত হবার মত গোপন সঞ্চয় তাদের আছে। সেজন্যই বোধহয় সম-সাময়িক সমালোচকেরা এ' বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সাহেবদের হার দেখবার জন্য লালায়িত সেখানে প্রাথমিক বিপর্যয়ে দর্শক মনে সংশয় ও আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। তাই সে' সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম। এ' বিষয়ে লিখিত তথ্যের অভাবে শেষ পর্যন্ত জনশ্রুতিকেই অবলম্বন করতে হল। সে' সঙ্কটকালে দর্শকদের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প করেছিলেন ৺কেবো-দা, ৺ভূপেন-দা, ৺হীরালালবাবু এবং ৺পলটু দাশগুপ্ত। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন শীল্ড-পরবর্তী যুগে মোহনবাগানের বিখ্যাত লেফ্ট আউট এবং তিনি ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তাদের মুখের কথাতেই জন-সাধারণের মনের সে' সময়ের ছবি যথাস্থানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

'সঞ্জয় উবাচ' বলেই শুরু হবে খেলার বিবরণ, তবে এ' সঞ্জয় ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ। বিপক্ষ শিবিরের মুখপাত্র এ' কাগজ, তবু তাদের কথাই শোনা যাক আগে।

খেলার বিবরণের পূর্বে সামান্য গৌরচন্দ্রিকা করে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (৩১ ৭.১১.) লিখলেন, "স্থানীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার উত্তেজনা তুঙ্গে পৌছেছিল গত শনিবার ক্যালকাটা মাঠে। সেদিন ঊনবিংশতম আই, এফ, এ শীল্ডের নাটকীয় প্রতিযোগিতার শেষ অঙ্কের উপর যবনিকা পাত হয়েছে। মাঠের ভিতরের ও বাইরের অভূতপূর্ব জনসমাগমের জন্য এ' দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ' স্মরণীয় ফাইন্যাল কিন্তু ভারতীয় সমাজের উঁচু তলা থেকে নীচু তলা পর্যন্ত সমস্ত লোকের নিকট অপূর্ব বরণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ—একটি ভারতীয় দল সর্বপ্রথম এ' প্রতিযোগিতাতে চরম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে একটি অসামান্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভারতীয়েরা এ' জয়লাভে সঙ্গতভাবেই গর্ব অনুভব করতে পারেন।"

"পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতাতে ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং দলগত ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এ' খেলাতে মোহনবাগান জিতেছে ২-১ গোলে।"

"অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, চমৎকার সঙ্ঘবদ্ধতা, বুদ্ধিদীপ্ত সম্মিলিত আক্রমণ এবং ব্যক্তিগত বল নিয়ন্ত্রণের প্রশংসনীয় ক্ষমতা ছিল ভারতীয় দলের খেলার বিশেষত্ব। গুণপণার ভিত্তিতে যোগ্যতর দলই যে এদিন বিজয়ী হয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করবে না।"

এ' প্রশস্তির পর ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ বলছেন, "টসে বিজয়ী হল ইষ্ট ইয়র্কস দলের অধিনায়ক জ্যাক্সন। তার দলকে নিয়ে তিনি কেল্লার দিকের মাঠে ব্যূহ রচনা করলেন। ইডেন উদ্যানের দিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল মোহনবাগান।"

"৫-৩৫ মিনিটে অভিলাষ খেলার সূচনা করলেন। প্রথমেই একটি সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে মোহনবাগান ইষ্ট ইয়র্কসের সীমানাতে হানা দিল। কিন্তু সৈনিক দলের লেফ্ট হাফ মার্টিন লম্বা লাথি মেরে বল পাঠালেন মোহনবাগান এলাকাতে। খেলা জমে উঠল।"

"এ' সময় দু' দলই পর্যায়ক্রমে তীব্র ভাবে আক্রমণ করল। খেলার গতি এখন অত্যন্ত ক্ষিপ্র হল। ইষ্ট ইয়র্ক্স উপর্যুপরি দুটি সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ রচনা করল। কিন্তু প্রথম বার রাজেন এবং পরে সুকুল তাদের গতিরোধ করলেন। পালটা আক্রমণ করল মোহনবাগান। জে, রায় দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়ে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতিক্রম করে এগিয়ে এসে সুন্দরভাবে সেণ্টার করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিজয়দাসের পায়ে বল দেয়া কিন্তু সেণ্টার হাফ জ্যাক্সন হেড করে সে' বলের গতি পরিবর্তন করলেন।"

জে, রায় বল নিয়ে ছুটছেন, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠেছে "কানু, কানু।" জ্যাক্সন হেড করা মাত্র দর্শকেরা আবার নীরব হয়ে গেল।

"অতঃপর সৈনিক দল মোহনবাগানের রক্ষণ বিভাগের উপর কিছু চাপের সৃষ্টি করল", বলছেন ইণ্ডিয়ান ডেউলি নিউজ। "কিন্তু এ' সময়ে নিল ফাউল থ্রো করলে এ' চাপের একটু লাঘব হল। কিন্তু সৈনিক দলের রক্ষণ বিভাগের তৎপরতার জন্য ভারতীয় দলও তখন সার্থক

আক্রমণ রচনা করতে সক্ষম হল না। কিন্তু রায় এবং ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয় ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখিয়ে বার বার সৈনিক দলের সীমানাতে অনুপ্রবেশ করছিলেন। দর্শকেরা চীৎকার করে তাদের উৎসাহ জোগাচ্ছিল।"

"সরকার এ' সময়ে অফসাইড হলে বল গেল মোহনবাগান এলাকাতে। জ্যাক্সন এ' সময়ে সুন্দরভাবে বল জুগিয়ে আক্রমণ রচনাতে সাহায্য করছিলেন, কিন্তু ক্লুকাস অফসাইড হওয়াতে মোহনবাগান তখন সাময়িক ভাবে নিস্তার পেল। রাজেনের ফ্রি সট থেকে বল এল শিবদাসের কাছে এবং তিনি একক প্রচেষ্টাতেই এগিয়ে গিয়ে গোল করতে প্রয়াসী হলেন। ব্যাক স্কালি ছুটলেন শিবদাসের পায়ে পায়ে। তবু শিবদাস গোলে বল মারলেন। ক্রেসি কিন্তু সাবলীল ভঙ্গীতে সে' বল ধরলেন।"

"অতঃপর ইষ্ট ইয়র্কস প্রবলভাবে আক্রমণ করে মোহনবাগানের কিছু উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল। একটি জোরদার আক্রমণ রচনা করে বার্চ সুন্দর একটি সুযোগের সৃষ্টি করে দিলেন হাওয়ার্ডকে। মোহনবাগানের পেনালটি সীমানার অনতিদূরে বল পেলেন হাওয়ার্ড এবং কালক্ষেপ না করে প্রচণ্ড জোরে নীচু করে সট মারলেন গোলে। হীরালাল প্রশংসনীয়ভাবে সে বল ধরলেন, কিন্তু মনে হল তার হাতে যেন একটি আগুনের গোলা।"

"পরিত্রাণ পেয়ে মোহনবাগান এগিয়ে গেল বল নিয়ে। হাবুল সরকার এখন একবার গোল করার চেষ্টা করলেন কিন্তু সে' সট প্রতিরোধ করতে ক্রেসির কোন বেগ পেতে হল না। উভয় দলই এ' সময়ে পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু আক্রমণ করল এবং হীরালালকে আর একবার হেডের সট রক্ষা করতে হল। প্রথমার্ধে কোন গোল হল না। গোলশূন্য প্রথমার্ধের খেলা এ'ভাবেই শেষ হল।"

"খেলার পুনরাবৃত্তি হতে না হতেই দেখা গেল সৈনিক দলের দাপট। প্রথম দশ মিনিট ইষ্ট ইয়র্কস একটানা আক্রমণের পর

আক্রমণ চালিয়ে মোহনবাগানের রক্ষণ বিভাগকে বিপর্যস্ত না হলেও বিশেষ বিব্রত করে তুলল। এ' সময়ে সুকুল, চ্যাটার্জি এবং রাজেনের নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না।"

"খেলাতে অবিসম্বাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেও সৈনিক দল কিন্তু নিজ ত্রুটির জন্যই কোন প্রকৃত সুবিধা অর্জন করতে পারল না। গোলের সামনে এসেও ইষ্ট ইয়র্কস যদি এত বেশী ছোট ছোট পাশে অনাবশ্যক বল আদান প্রদান করে কালক্ষেপ না করত এবং গোলে বল মারতে অধিকতর তৎপর হত তা' হলে হয়ত এ' চাপেই তারা এগিয়ে যেত।"

"মোহনবাগান অতঃপর পালটা আক্রমণ করে চাপের লাঘব করল। খেলা এ' সময়ে বেশীর ভাগ মাঝ মাঠে আবদ্ধ থাকলেও খেলার গতি ছিল অত্যন্ত তীব্র। উত্তেজনারও কোন অভাব ছিল না।"

"সৈনিক দলের এ' প্রকারের চাপ একেবারে বিফল হল না। পনর মিনিট খেলার পর ইষ্ট ইয়র্কসই প্রথম গোল করল। পেনালটি চতুষ্কোণের অল্প দূরেই হাণ্ডবলের অপরাধে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটি ফ্রি কিক পেল সৈনিক দল। জ্যাক্‌সন তীব্র জোরে ঘাস-কাটা সটে খেলার প্রথম এবং তার দলের একমাত্র গোলটি করলেন। হীরালাল ডানদিক চেপে দেহ নিক্ষেপ করলেন একটু দেরীতে। তার আগেই বল প্রবেশ করেছে জালে।" (১-০)

উঠল আকাশে কালো ঘুড়ি।

নামল ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা।

মাথায় তাদের বজ্রাঘাত হয়েছে। ভারতীয় দলের সমর্থকদের মুখ শুকিয়ে গেছে। মাঠের অপরদিকে বীভৎস উল্লাসের তাণ্ডব।

সৈনিক দর্শকেরা তাদের আসনের সামনে খেলার আগে থেকেই একটি কাগজ দিয়ে তৈরী শীল্ড সাজিয়ে রেখেছিল। এখন শুরু হল সেই কাগুজে শীল্ড নিয়ে তাদের উন্মাদ নৃত্য। হইচই করে এবং ভারতীয়দের প্রতি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে শীল্ড নিয়ে শুরু করল তারা নাচ।

মিডল্‌সেক্স দলের বিরুদ্ধে খেলাতে রেফারীর একদেশদর্শিতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ভারতীয় দর্শকেরা অশালীন ভাষাতে গালাগাল করেছিল তাই নিয়ে কতই না উপদেশ বর্ষণ করেছিলেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ আজ কিন্তু তাদের মুখে সৈনিক দলের এ' আচরণের প্রতিবাদে একটি কথাও নেই। সেই যে বলে, "ও বাড়ীর ছেলেটা, নাচে যেন বাঁদরটা ; এ বাড়ীর ছেলেটি, নাচে যেন ময়ূরটি।"

গ্রাম্য প্রবাদ, কিন্তু মর্মান্তিক সত্য।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ নীরব থাকলেও সৈনিক দলের এ' জঘন্য আচরণ মিথ্যা নয়। এ' গল্প শুনেছি অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে।

এ' সময়ের খেলার কথা লিখছেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, "প্রথম রক্ত মোক্ষণ করে দুর্বার হয়ে উঠল ইষ্ট ইয়র্কস। হবারই কথা। তীব্র আক্রমণ বিস্তার করে সৈনিক দল এখন উপর্যুপরি তিনটি কর্ণার আদায় করল। কিন্তু একটিও কাজে লাগাতে পারল না!"

এ' তিনটি কর্ণারের প্রথমটিই হয়েছিল সেনগুপ্তের গায়ে লেগে। তখন পেনালটি দেন নি বলে পরে হায় হায় করেছিলেন রেফারী পুলার। কিন্তু আগেই বলেছি যে কোন সংবাদপত্রেই এমন একটি ঘটনার উল্লেখ নেই। ক্যালকাটা ক্লাবের কয়েকজন সভ্য (?) ভিন্ন আর কারো চোখেই পড়ে নি এ' না-দেয়া পেনালটি। পুলারের নিজের চোখেও পড়ে নি, কিন্তু পরে অন্য লোক তার চোখ খুলে দিয়েছিল।

ভারতীয় দলের সমর্থকদের মুখ ও বুক দুই-ই তখন শুকিয়ে গেছে। বড় আশা করে তারা আজ মাঠে এসেছিল। সাহেবদের পরাজয়ের উপর তারা স্বপ্ন-সৌধ গড়ে তুলেছিল মনে মনে। সে' সৌধ ভেঙ্গে পড়ল তাসের ঘরের মত। তীরে এসেই বুঝি তরী ডুবল। বুঝি সফল হল না লক্ষ লক্ষ লোকের স্বপ্ন। নিরাশার কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল দর্শকদের মন।

তবু আশাবাদীরও কোন অভাব নেই।

মাঠে তখন তারা মোহনবাগানের খেলা দেখছে। মোটেই পরাজিত দল বলে মনে হচ্ছে না তাদের। তাই একে অন্যকে সাহস জোগাচ্ছে। বলাবলি করছে, "গোল হয়েছে ত কি হয়েছে? এখনও খেলার বাকী আছে অনেক সময়। মোহনবাগান এ' গোল নিশ্চয়ই পরিশোধ করবে।"

অর্ধেক ভরতি জলের গ্লাসকে অর্ধেক শূন্য বলার লোকেরও কিছু অভাব নেই। গলা শুকিয়ে তারা বলছে, "কাজ এত সোজা নয়।" "সোজা নয়?" সাহসী কণ্ঠ থেকে আসে প্রশ্ন ও প্রতিবাদ। "ভুলে যাচ্ছ কেন কি হয়েছিল মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে খেলাতে। সে'দিন এক গোলে পিছিয়ে পরে সমান সমান হয় নি মোহনবাগান?"

সে'দিন তাই হয়েছিল বটে। কিন্তু সে'দিনের কপাল কি আজও হবে? এমনি আশা নিরাশার খেলা চলছে জনসাধারণের মনে।

এদিকে খেলা চলেছে তখন মাঠে। হঠাৎ সেই নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল।

লিখলেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, "কুড়ি মিনিটের সময় হঠাৎ শোনা গেল জন-সমুদ্রের গর্জন। জনতা তখন পুনর্জীবন লাভ করেছে। মোহনবাগান তখন একটি আক্রমণ রচনা করেছে। পায়ে পায়ে বল আদান প্রদান করে চমৎকার একটি আক্রমণ গড়ে তুলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মোহনবাগানের অগ্র-গমন। তারা তখন এসে গেছে প্রতি-পক্ষের গোলের সামনে। বল শিবদাসের পায়ে। উত্তেজিত জনতার মুখে "শিবু, শিবু" চীৎকার। শিবদাস গোল করে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। পরিশোধমূলক গোলটি হল মোহনবাগানের।" (১-১)

"উত্তেজিত জনতা এ' গোলটিকে যে সম্বর্ধনা জানাল তা' বর্ণনা করা অসম্ভব; তা' কেবল অনুমান করাই যেতে পারে।"

কুরুক্ষেত্র সমরে পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র ইত্যাদি মহাশঙ্খের

ধ্বনিতে নাকি "...ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥" সেই শঙ্খধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিল। উপস্থিত জনতার এ' হর্ষধ্বনিও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল। এ' চীৎকারে যবন পুত্রদের নিশ্চয়ই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল এবং বুক ফেটে গিয়েছিল। সৈনিক পুঙ্গবেরা তখন কাগুজে শীল্ড লুকিয়ে ফেলেছে। বিষাদের প্রতিমূর্তির মত বসে আছে নিজ নিজ আসনে।

'মোহনবাগান গর্জনে' আগেই ঘোষিত হয়েছিল সুসংবাদ। এখন আকাশে উড়ল লাল-সবুজ ঘুড়ি।

খেলার আর বেশী বাকী নেই। সমান সমান হয়েছে মোহনবাগান, সুতরাং জনতার উৎসাহের কিছু কমতি নেই। খেলছেও বটে এখন মোহনবাগান। যেমন পায়ের ভেলকি, তেমনি অসামান্য ক্ষিপ্র গতি এবং ততোধিক চমৎকার তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা। সমস্ত মাঠ জুড়ে তখন চলছে লাল-সবুজ জার্সির খেলা। সৈনিক দল ছত্রভঙ্গ, দিশাহারা।

এমন প্রচণ্ড চাপেও আর একটি গোল হবে না? জনসাধারণের মনে এখন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা।

এই পরিস্থিতিতে লিখছেন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, "খেলার মাত্র আর তিন মিনিট বাকী। কি হয়,কি হয়? ড্র, জয়,না পরাজয়? সাফল্য এত কাছে, কিন্তু এত দূরে! ঠিক এ' সময়ে শিবদাস আবার তার স্বকীয় প্রতিভাতে ভাস্বর হলেন। বল পেয়ে শিবদাস চললেন পায়ে পায়ে এগিয়ে। পাঁকাল মাছের মত এড়িয়ে গেলেন জ্যাক্সনকে এবং পরে প্রতারিত করলেন মার্টিনকে। শিবদাস এখন ইষ্ট ইয়র্কস দলের গোলের সামনে। ক্রেসি দম বন্ধ করে সটের প্রতীক্ষা করছেন।"

"চতুর শিবদাস এখন দেখলেন গোল না করেও ক্রেসির মত গোল-রক্ষককে কেমন করে সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত করা যায়। চোখ কান সজাগ করে ক্রেসি প্রস্তুত বুঝতে পেরে শিবদাস নিজে সট করলেন না।

মাপা পাশে বল তুলে দিলেন অভিলাষের পায়ে। আর অভিলাষই লক্ষ হিয়ার অভীষ্ট পূর্ণ করলেন জয়সূচক গোলটি করে।" (২-১)

এ' গোলটি সম্বন্ধে ষ্টেট্সম্যান বলেছিলেন, "যে আক্রমণ থেকে মোহনবাগানের জয়সূচক গোলটি হয়েছিল তেমন সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আক্রমণ বিভাগের পাঁচ জনের পায়েই ঘুরেছিল সেই বল। সৈনিক দল বিভ্রান্ত; অন্য সকলে মন্ত্রমুগ্ধ। বাম পার্শ্বে শিবদাস প্রথমে বলটি ধরলেন। একজনকে কাটিয়ে বল দিলেন ভাই বিজয়দাসকে এবং দেখতে না দেখতে সরকারের মাধ্যমে বল গেল জে, রায়ের কাছে। অভিলাষ তখন গোলের সম্মুখে পৌঁছেছে। রায় লম্বা ক্রশ সটে আবার বল দিলেন শিবদাসকে। তিনি তখন লাইন ছেড়ে ভিতরে ঢুকেছেন। শিবদাস ব্যাক দু' জনের মাঝ দিয়ে ঢুকে ব্যাক পাশ দিলেন অভিলাষকে এবং অভিলাষ তা' আস্তে করে ঢুকিয়ে দিলেন গোলে।"

ইষ্ট ইয়র্কস দলের কমাণ্ডিং অফিসার এ' গোল দুটি সম্বন্ধে রেফারী পুলারকে বলেছিলেন, "আমি ইংলণ্ডে এবং ভারতে অনেক ফুটবল খেলা দেখেছি। কোন খেলাতেই আমি এমন অপরূপ দুটি গোল দেখি নি।"

পুলার নিজেও এ' গোল দুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, "মোহনবাগান তখনও এক গোলে পিছিয়ে। হঠাৎ মাঝ মাঠে বিজয়দাস একটি বল ধরে চোখের পলকে অল্প কয়েক গজ জায়গার মধ্যে দু' জনকে কাটালেন। তারপর বামদিকে শিবদাসের সঙ্গে বল আদান প্রদান করে তিনি এগিয়ে চললেন। এ' অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি আক্রমণে অংশ নিলেন অভিলাষ এবং সরকার। সৈনিক দলের রক্ষণ বিভাগ গতিতে পরাজিত, নৈপুণ্যে প্রতারিত। তাদের আটকাতে গিয়ে নিজেরাই বেসামাল হচ্ছে। এমন আক্রমণে গোল না হয়ে যায় না এবং শেষ পর্যন্ত তাই হল।"

দ্বিতীয় গোলটির আক্রমণ ধারা সম্বন্ধেও পুলারের অনুরূপ প্রশংসা। "বামদিকে শিবদাস সূচনা করলেন এই আক্রমণের। বল ঘুরল পায়ে পায়ে। লেফ্‌ট আউট, লেফ্‌ট ইন, রাইট ইন করে বল আবার এল শিবদাসের কাছে। রায়ের সেণ্টার থেকে বল প্রায় বাইরেই যাচ্ছিল—গোল লাইন থেকে বল মাত্র গজ তিনেক দূরে। ইষ্ট ইয়র্কসের দুই ব্যাকের মাঝ দিয়ে গলিয়ে এসে সেই বল ধরলেন শিবদাস এবং তারপর ক্রেসির নাগালের বাইরে বলটি ঠেলে দিলেন অভিলাষকে। গোলের জন্য অভিলাষকে বলটি একবার পায়ে ঠেকাতে হল মাত্র।"

এত কথার পরও পুলার বলছেন, "একই খেলাতে পাঁচ পাঁচটি ফরোয়ার্ডের মধ্যে এমন দুটি সম্মিলিত আক্রমণ ইতিপূর্বে আমি আর কখনও দেখিনি।"

দ্বিতীয় গোলটির পর আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে উঠল আবার আনন্দ ধ্বনি। আবার উড়ল লাল-সবুজ ঘুড়ি।

তারপর ?

তারপর এই মুহূর্তটি বাঙ্গালীর জীবনে ধ্রুবতারার মত অক্ষয় হল।

খেলার উপরোক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের অনুসরণে। এ' সংবাদপত্র ছিল ইঙ্গ সমাজের মুখপাত্র, অর্থাৎ বিদেশী সঞ্জয়।

এবার ভারতীয় শিবিরের সঞ্জয়, তথা অমৃতবাজার পত্রিকার গণেন মল্লিকের বক্তব্য থেকে কিছু তুলে ধরব।

একই খেলার উপর লিখেছেন দু'জনেই। তাই দৃষ্টিভঙ্গী সামান্য বিভিন্ন হলেও তথ্য সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রের বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। গরমিলও অবশ্য আছে। পুনরুক্তি বর্জনের জন্য এখন সেই গরমিলের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

"শিবদাসের পিছনে পিছনে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে মোহনবাগান মাঠে নামলে জনতা তাদের মেঘমন্দ্র অভিনন্দন জানাল," বলছেন গণেন

মল্লিক অমৃতবাজার পত্রিকার (৩১.৭.১১) পাতাতে। "টসে হারল মোহনবাগান। খেলাতে প্রথম কয়েক মিনিট মোহনবাগানেরই প্রাধান্য দেখা গেল। মাঝে মাঝে কিছু সুযোগের সৃষ্টি করছিল বটে তারা, কিন্তু প্রকৃত সুবিধা কিছুই হল না। এ' সময়ে উঁচু বলে সৈনিক দলের হেড করার কৃতিত্ব ছিল তারিফ করার মত। তাছাড়া হাওয়ার্ড একবার জোর সটে গোল করার চেষ্টা করলে হীরালাল তা' রক্ষা করেন। প্রথমার্ধে কোন গোল হল না।"

দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে সৈনিক দলের প্রাধান্য গণেন মল্লিকের লেখাতেও স্বীকৃত। ইষ্ট ইয়র্কস দলের গোলটি সম্বন্ধেও তার একই কথা। কিন্তু মোহনবাগানের প্রথম গোলটি সম্বন্ধে গণেন মল্লিক বলছেন অন্য কথা।

অমৃতবাজারের মতে, "বিজয়দাস ও শিবদাস সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ রচনা করে অগ্রসর হন এবং বিজয়দাস পরিশোধমূলক গোলটি করেন। খুব হ্রস্ব কোণ থেকে মন-মাতান তীব্র সটে এ' গোলটি করেন বিজয়দাস।" ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ এবং ষ্টেট্সম্যান এ' গোলটির কৃতিত্ব দিয়েছেন শিবদাসকে।

অন্যান্য সমালোচকের সঙ্গে গণেন মল্লিকের বর্ণনার আরও ছোট-খাটো অমিল আছে। কিন্তু গণেন মল্লিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সৈনিক দলের ক্রীড়া-কৌশলের এমন একটি ত্রুটি ধরা পড়েছিল যার কথা আর কেউ বলেন নি। খেলার সে' পরিস্থিতিতে এ' ত্রুটি বড় সামান্য ছিল না।

বিশাল জনতার একটানা চীৎকারে সৈনিক দল বিব্রত বোধ করেছিল কিনা জানি না। কিন্তু মোহনবাগানের প্রথম গোলটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট ইয়র্কস দলের খেলাতে রক্ষণমূলক মনোভাব দেখা দিল। মনে হল তারা যেন খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ করার দিকেই নজর দিয়েছে। হয়ত ভেবেছিল যে আজ বাঁচলে কাল আবার লড়বে।

সকলেই অবশ্য এক বাক্যে বলেছেন যে এ' সময়ে মোহনবাগানের দু'টি প্রতিভাদীপ্ত অপূর্ব সম্মিলিত আক্রমণে সৈনিক দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তারা ভীষণ বিব্রতবোধ করছিল। কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে যে তারা আক্রমণ বিভাগের একজন খেলোয়াড়কে পিছনে নামিয়ে এনে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল, এ' ব্যাপার গণেন মল্লিকের শ্যেনদৃষ্টি ভিন্ন আর কারো চোখে পড়েনি। সৈনিক দলের এ' ভ্রমাত্মক নীতির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল মোহনবাগান। মনোমোহন তখন এগিয়ে এসে প্রায় ষষ্ঠ ফরোয়ার্ড হয়েছেন।

বলছেন গণেন মল্লিক, "ইষ্ট ইয়র্কস এ' সময়ে রক্ষণ বিভাগের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুরোভাগের একজন খেলোয়াড়কে পিছনে নামিয়ে আনল। খেলার এ' পরিস্থিতিতে সৈনিক দলের এ' কৌশল কার্যকরী হল না। বরং এ' সুযোগে মনোমোহন ষষ্ঠ ফরোয়ার্ড হয়ে এগিয়ে এসে একটি সুন্দর পাশ দিলে অভিলাষ জয়সূচক গোলটি করলেন।"

আর সকলেই কিন্তু বলেছিলেন যে, শিবদাসের কাছ থেকে বল পেয়েই অভিলাষ দলের দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন। বর্তমান ফুটবল রসিকের নিকট এ' সামান্য অসঙ্গতি নিশ্চয়ই খুব বড় হয়ে উঠবে না।

বড় কথা, সেই ঐতিহাসিক ফাইন্যালে মোহনবাগান জিতেছিল ২-১ গোলে।

আরো বড় কথা, সেই সর্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড জয়ের গৌরব অর্জন করেছিল একটি ভারতীয় দল।

মোহনবাগান : এইচ, মুখার্জি ; এ, সুকুল ও এস, চ্যাটার্জি ; এম, মুখার্জি, আর, সেনগুপ্ত ও এন, ভট্টাচার্য ; জে, রায় (কানু), এস, সরকার (হাবুল), এ, ঘোষ, বি, ভাদুড়ী ও এস, ভাদুড়ী (অধিনায়ক)।

ইষ্ট ইয়র্কস : ক্রেসি ; হুইটনি ও স্কালি ; মার্টিন, জ্যাক্সন (অধিনায়ক) ও নিল ; বার্চ, হাওয়ার্ড, হেউড, ডিক্সন ও ক্লুকাস।

রেফারী ঃ মিঃ এইচ্, জি, পুলার।

লাইন্সম্যান ঃ মেসার্স এ, ম্যাক্রেডি ও জে, মার্সডেন।

সেদিন মাঠে জিতেছিল মোহনবাগান। আর সেই জয়ের আনন্দ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর মনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে সামান্য অসঙ্গতি থাকলেও আজ তা' বড় হয়ে উঠবে না।

প্রত্যক্ষদর্শীর লেখাগুলি থেকে বর্তমান ফুটবল প্রেমিক কেবল দেখবেন যে সেদিন কোন্ পথে বাঙ্গালীর পুঞ্জীভূত বিফলতার মধ্যে লেগেছিল সার্থকতার স্পর্শ। তারা দেখবেন সেদিন খেলার মাঠের জয়লাভকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী কেমন করে নব-লব্ধ জাতীয়তা-বোধের পুষ্টি সাধন করেছিল।

লক্ষ লক্ষ লোক ছিল সেদিন মাঠে। তারা অনেকেই ফুটবল কি জানে না, বোঝে না। তারা সেদিন কি দেখেছিলেন? মোহনবাগান শীল্ডবিজয়ী হল? না; তারা দেখলেন সাহেবদের হার হল।

বর্তমান যুগের ফুটবল রসিকেরা কেবল দেখবেন কেমন করে বাঙ্গালী সেদিন খেলার মাঠের আনন্দ থেকে মহত্তর আনন্দলোকে প্রবেশ করেছিল। দেখবেন,"......পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব পরিশেষ্যতে"—উপনিষদের এই মন্ত্র সেদিন কেমন করে সার্থক হয়ে উঠেছিল বাঙ্গালীর মনে।

খেলার মাঠের জয়লাভের পূর্ণ আনন্দ থেকে উদয় হয়েছিল বিদেশী শাসকদের পরাজিত করার বিমল আনন্দ। সে' আনন্দের শেষ কণা পর্যন্ত সেদিন তারা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন।

বর্তমানেও কিন্তু সে' আনন্দ তেমনি পূর্ণ, তেমনি রসঘন।

* * *

শীল্ড জয় এখন সম্পূর্ণ।

মাঠের ফসল তোলা হল ঘরে। এবার নবান্নের উৎসব।

নবান্নের উৎসবের প্রথম পর্যায় পালিত হল জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসে। সেদিন কোন পরিকল্পনা করে এ' উৎসব উদ্‌যাপিত হয় নি। বিনা আয়াসেই প্রবাহিত হয়েছিল আনন্দের জোয়ার। তাতে সকলেই ভেসেছিলেন মনের আনন্দে। কোন আয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু আলোড়নেরও কোন অভাব ছিল না।

সেই ২৯শে জুলাই এর মেঘমেদুর সন্ধ্যাতে বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গার জলধি তরঙ্গ উচ্ছল হল। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সমস্ত লোক এ' ঐতিহাসিক কীর্তিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। মোহনবাগান ভারতের গৌরব, ভারতীয়দের গৌরব বলে প্রশংসাতে মুখরিত হলেন সকলে।

এ' সমস্তই কিন্তু একদিন পরের কথা। বুদ্ধিজীবী সমাজের নবান্ন-উৎসবের কথা।

জনসাধারণের নবান্ন উৎসব শুরু হল খেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। মাঠে শেষ বাঁশি বাজতে না বাজতেই মাঠের বাইরের জনতা আনন্দে উত্তাল হল।

সেই মুহূর্তে খেলা ভাঙ্গলেও মেলা ভাঙ্গে নি। বরং আরো জমে উঠেছে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান জনতার মধ্যে শুরু হল গলাগলি, কোলাকুলি। কেউ কাউকে চেনে না ; তবু পাশের লোককে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করছে, "জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।" অপরিচয়ের ব্যবধান একেবারেই ঘুচে গেছে। সকলেই এই অপূর্ব আনন্দের অংশীদার। আনন্দ প্রকাশ করছে জানা কথা একে অন্যকে জানিয়ে। কথা কিন্তু একটিই—"জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।" গলাগলি,

কোলাকুলি করে একই কথা পরস্পরকে জানাচ্ছে। সকলেই শুনছে এবং শোনাচ্ছে।

এমনি করে কলরব করতে করতেই সেই ভীড় দীর্ঘায়িত হল মনুমেণ্ট পর্যন্ত। ময়দান ছেড়ে যাবার সামান্য ইচ্ছাও কারো নেই। কিন্তু ভীড়ের চাপেই সেই ভীড় ঢুকে পড়েছে ধর্মতলাতে। তারা এখন ঘর ভুলেছে, বাড়ী ভুলেছে। তাদের মন জুড়ে বসেছে মোহনবাগান। তারা এখন কাছ থেকে একবার দেখতে চায় বিজয়ী বীরবৃন্দকে। বলতে চায়, "তোমরা আমাদের সার্থক করেছ। তোমরা আমাদের প্রাণের আনন্দ।"

কিন্তু এখনই তাদের কাছে যাবার কোন উপায়ই নেই। তাই জনতা চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। আই, এফ, এ শীল্ড নিয়ে শ্যামবাজারে বোসেদের বাড়ীতেই যাবে মোহনবাগান। সেখানেই তারা দেখবে দুলালদের। তাই পা বাড়িয়েছে তারা শ্যামবাজারের পথে।

বিজয়ী দল তখনও রণক্ষেত্রেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাদের বিজয়-বার্তা বহন করে ধর্মতলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জনস্রোত। চীৎকার করে বলছে, "জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।" কলিকাতার লোককে শুভ সংবাদ জানাতে জানাতে এ' জনতা আগ বাড়িয়ে চলেছে শ্যামবাজারে।

কোথা থেকে জোগাড় হয়েছে ব্যাণ্ড, কোথা থেকে জোগাড় হয়েছে বাতি। নাচে গানে, বাজনাতে বাত্তিতে রাজপথ মুখরিত করে এবং পুরবাসীদের সচকিত করে অগণিত মানুষের স্রোত চলেছে শ্যামবাজারের দিকে।

মোহনবাগান দলের বিজয়ী বীরেরা কিন্তু তখনও ক্যালকাটা মাঠে। অপেক্ষা করছেন আনুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণের জন্য। আর

তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অগণিত লোক। শীল্ড নিয়ে বেরোলেই তাদের নিয়ে যেতে উঠবে বলে তারা অপেক্ষা করছে ময়দানে।

কিন্তু এখন সেই বিশাল জনতা আর কেবল ময়দানে ছড়িয়ে নেই। এক অংশ আগেই চলেছে শ্যামবাজারের পথে। আর এক অংশ এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে মোহনবাগান মাঠে। বর্তমান প্রেসিডেন্সী মাঠ ছিল ১৯১১ সালে মোহনবাগানের মাঠ। তখন সেখানেই মোহনবাগানের তাঁবু। তারা এখান থেকেই অনুগমন করবে বিজয়ী দলের। একসঙ্গে যাবে শ্যামবাজার পর্যন্ত।

ততক্ষণে কিন্তু ময়দানে দাঁড়িয়ে গাড়ী। মোহনবাগান তাঁবুর সামনে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে আছে চার-ঘোড়ার টানা গাড়ী। ইতিমধ্যেই ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে সেই গাড়ী। অবিরাম আসছে পুষ্পার্ঘ্য। কোথা থেকে আসছে, কে পাঠাচ্ছে কেউ জানে না। মোহনবাগান তাঁবু ফুলে ফুলময়।

টগবগ করছে চার চারটি ওয়েলার ঘোড়া। তাদেরও ফুল সাজে সাজিয়েছে আনন্দ উদ্বেল জনতা। গাড়ী তারা ঘিরে রেখেছে; তাকিয়ে আছে ক্যালকাটা মাঠের দিকে। অত্যুৎসাহী যুবকেরা বলছে এ' গাড়ী ঘোড়াতে টানবে না, টানবে তারা। কোন কথাই শুনতে চায় না তারা। বুকে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে এক বিপুল জনতা। কখন আসবে তারা? বিজয়ী খেলোয়াড়েরা মাঠ ছেড়ে বেরোলেই তারা বলবে, "উঠ, উঠ জয় রথে তব।"

কিন্তু 'যেতে নাহি দিব' বলে তখন ক্যালকাটা মাঠেও দাঁড়িয়ে আছে অগণিত গুণমুগ্ধ। তাদের সহর্ষ কলরবে মেদিনী কম্পিত, গগন স্তম্ভিত। সেখানে এখনও বাকী আছে শেষ অনুষ্ঠান। পূজা শেষের নির্মাল্য। তাঁরা দাঁড়িয়ে দেখল মিঃ কার্টার শীল্ড তুলে দিয়েছেন শিবদাসের হাতে। দুর্বল এবং ভাবাবেগে অভিভূত শিবদাস শীল্ড ধরে রাখতে পারছেন না। এগিয়ে গেল বলিষ্ঠ তরুণ ভূতি সুকুল।

শিবদাস তার হাতে শীল্ড ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হলেন। তারা দেখল সোনার মেডেল দিচ্ছেন মিসেস্ ওয়াটসন প্রত্যেক বিজয়ী বীরের হাতে।

শীল্ড হাতে নিয়ে শিবদাসের মুখে হাসি, চোখে জল।

অপরূপ সুন্দর এবং গৌরবোজ্জ্বল এই মুহূর্তটি একান্তই শিবদাসের। আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের ভাগ্যে জুটবে না এই অভূতপূর্ব সম্মান।

আই, এফ, এ শীল্ডই না হয় প্রথম জিতেছে। খেলার মাঠে সম্মান আহরণ মোহনবাগানের নূতন নয়। প্রিমিয়ার ভারতীয় দল ইতিপূর্বে ট্রেড্‌স কাপ এবং কুচবিহার কাপ জিতেছে বহু বহু বার। সুতরাং পুরস্কার গ্রহণের গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের সঙ্গে মোহনবাগানের পরিচয় আছে।

শীল্ড হাতে নিয়ে শিবদাস বললেন, "থ্রি চিয়ার্স ফর ইষ্ট ইয়র্কস।" মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের কণ্ঠ থেকে আওয়াজ উঠল, "হিপ হিপ হুরে", "হিপ হিপ হুরে", "হিপ হিপ হুরে।" বিজিতের প্রতি বিজয়ীর শ্রদ্ধা নিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল।

তারপর পা বাড়ালেন তারা তাঁবুর দিকে। রণক্লান্ত সৈনিকেরা চলেছেন নিজ শিবিরে। প্রেসিডেন্সী মাঠের তাঁবু আর এখন সামান্য শিবির নয় কিন্তু। জন-মানসে সে' শিবির এখন হয়ে উঠেছে মন্দির।

এমন সময়—

এ' কাহিনী অনেকেই হয়ত শুনেছেন। আমি শুনেছি অনেক ভাবে, অনেকের মুখে। নায়ক নিজেও এ' কাহিনী শুনিয়েছেন আমাকে।

অলৌকিক কাহিনী। যুক্তিবাদী মনের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতে, সেই মুহূর্তে ছিল একটি অপরূপ যাদু। লক্ষ লক্ষ মানুষের মন থেকে রূপকথার সোনার কাঠির ছোঁয়াতে হঠাৎ যেন দেড়

শত বছরের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে গিয়েছে। সাফল্যের ও সার্থকতার নূতন স্বাদে তাদের মন ভরে উঠেছে। জাতির জীবনে দীর্ঘস্থায়ী গ্রহণের পর যেন এসেছে মুক্তিস্নানের পুণ্য লগ্ন। তারা শুধু আনন্দে উতলা নয়, কেমন যেন অভিভূত।

অলৌকিক উপলব্ধির উপযুক্ত বাতাবরণ বটে!

তার উপর এ' কাহিনীর নায়ক ছিলেন ৺সুধীর চ্যাটার্জি নিজে। উচ্চ শিক্ষিত ৺সুধীরবাবু অসত্য কাহিনী বলার লোক ছিলেন না। তা' ছাড়া, সত্য না হলে সুস্থ মস্তিষ্কে ইয়ং বেঙ্গলের কোন প্রতিনিধিই এমন গল্পের নায়ক হতে চাইতেন না। খৃষ্টান ৺সুধীর চ্যাটার্জি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। পরবর্তী জীবনে তিনি ধর্মযাজক হয়েছিলেন। এ' অসামান্য এবং অতিপ্রাকৃত উপলব্ধির উপযুক্ত পাত্র ও ক্ষেত্র ছিলেন বোধহয় একমাত্র ৺সুধীরবাবুই।

"এমন সময়—" বলেছিলেন ৺সুধীরবাবু। তখন পরিণত বয়স তাঁর, তিনি তখন একজন সর্বজনমান্য ধর্মযাজক। "এমন সময় শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উত্তরীয়—নীচে শুভ্র উপবীত—পরিহিত এক ব্রাহ্মণ। শ্বেত শ্বশ্রু-গুম্ফ মণ্ডিত তাঁর মুখ; পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। হঠাৎ যেন মাটি ভেদ করে উদয় হলেন। দাঁড়ালেন এসে আমার পাশে।"

"এ' জনতার মধ্যে তিনি নিতান্তই বেমানান। তাই বোধ হয় তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। চারিদিকের এ' আনন্দ মাতাল জনতার মধ্যে তিনি স্থির, ধীর। কোন চাঞ্চল্যই নেই। অদ্ভুত প্রশান্ত ব্যক্তিত্বে এ' ব্রাহ্মণ আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তাঁর গৌরবর্ণ মুখে আমি যেন একটু চাপা উত্তেজনার আভাষ লক্ষ্য করেছিলাম।"

"একেবারে আমার পাশেই তিনি দাঁড়িয়ে। কোন ভূমিকা না করে, নিম্ন অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে আমার কানে কানে বললেন, 'এটা ত' হল। ওটা কবে হবে?' তারপর আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলেন অদূরে ফোর্ট উইলিয়মের উপর উড্ডীন ইউনিয়ন জ্যাকটি।"

"খুবই নিম্ন কণ্ঠে কথা বলছিলেন তিনি। ঐ তুমুল কোলাহলের মধ্যে অন্য অবস্থাতে তাঁর কথা হয়ত আমার কানেই যেত না। কিন্তু তিনি বললেন এবং আমি স্পষ্ট শুনলাম, "ওটা কবে হবে?"

এ'টুকু বলেই ৺সুধীরবাবু থেমে গিয়েছিলেন। বোধ হয় তখন তার মনে সেই ব্রাহ্মণের মূর্তিটি ভেসে উঠেছিল। তারপর, আত্মগত ভাবে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি ইয়ং বেঙ্গল, খৃষ্টান। তবু তখন আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে এই ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করে ধন্য হই। সঙ্কোচ কাটিয়ে সহজ হতে পারলাম না। তা' না করে আমি নীরবে বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকলাম।"

"ব্রাহ্মণের সেই প্রশ্নে তখন আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল তা' আজ মনে করা সম্ভব নয়। কেবল মনে আছে, আমি নত মস্তকে নীরব হয়েই ছিলাম।"

"আমার পাশেই ছিল স্কটিশ চার্চ কলেজের আমারই এক সতীর্থ। জবাব দিলেন সেই বন্ধু।" বললেন, "যেদিন মোহনবাগান আবার শীল্ড জিতবে সেদিন ওটা হবে।"

"তাকিয়ে দেখি ব্রাহ্মণ পাশে নেই। সামনে পিছনে কোথায়ও তাকে দেখতে পেলাম না। একেবারেই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছেন।"

৺সুধীরবাবুর গল্প শেষ।

তিনি নিজে এ' কাহিনী অনেককেই বলেছেন। সুতরাং, একে অলীক বলার উপায় নেই। যদিও ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অলৌকিক। কিন্তু এমন কিছু একটা না ঘটলে সে' সন্ধ্যার চিত্র যেন সম্পূর্ণ হত না।

সেই জনসমুদ্রে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি আশ্চর্যজনক হতে পারে, কিন্তু একে অবিশ্বাস্য বলা সঙ্গত নয়। জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে এসেছিলেন এক মহাপুরুষ। জানতে চাইলেন "ওটা কবে হবে?"

গল্পটি সুন্দর এবং সেই সন্ধ্যার জন-মানসের সঠিক প্রতিধ্বনি।

কিন্তু আমি এখন ভাবছি ৺সুধীরবাবুর সেই বন্ধুটির কথা। ভাবছি, এক যুবকের হঠাৎ বলা একটি কথা কেমন করে সফল ভবিষ্যৎবাণী হয়ে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়মে ইউনিয়ন জ্যাক অবনমিত করে ভারতের ত্রি-বর্ণ লাঞ্ছিত পতাকা তোলা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সে' বৎসরই মোহনবাগান দ্বিতীয় বার শীল্ডবিজয়ী হয়েছিল।

হয়ত কাকতালীয় ঘটনা। কিন্তু সব ভবিষ্যৎবাণীই কি কিছু পরিমাণে তা' নয়?

গল্পের আমেজে অপেক্ষমান জয়-রথের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। গাড়ী দাঁড়িয়েই ছিল এবং আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল। আস্তে আস্তে খেলোয়াড়েরা নিজ শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন এবং একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এতক্ষণ ধরে এত লোকের নয়নে নয়নে থাকার অভিজ্ঞতা খুব আরামদায়ক নয়। এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে এসে তারা সহজ হলেন; বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হলেন। তারপর আস্তে আস্তে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন সেই অমর একাদশ।

সর্বাগ্রে দলনেতা শিবদাস।

একাদশ বীর আরোহী হলেন সেই গাড়ীতে। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেই গাড়ী চলল এগিয়ে। এগোচ্ছে বটে, কিন্তু জনতার পায়ের সঙ্গে তাল রেখে চলছে। ধীরে, অতি ধীরে। ভীড় ঠেলে গাড়ী এগোতে পারছে না।

বাঙ্গালীর জয় এবং সাহেবদের পরাজয় প্রত্যক্ষ করার জন্য ময়দানে এসেছে লক্ষাধিক লোক। বেশীর ভাগই ফুটবলের আকর্ষণে আসে নি। তারা এসেছে "শুনি নাই কভু, দেখি নাই কভু" এমন একটি অপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হতে। পুরুষানুক্রমে এ' সব দূর দূরান্তের গ্রাম্য অঞ্চলের লোক সাহেবদের অনেক কিল খেয়েছে। সে' কিল আর একজন ফিরিয়ে দেবে, এ' বিমলআনন্দ উপভোগ করতে তারা এসেছে।

যতক্ষণ খেলা চলেছিল, মনে ছিল আশা-নিরাশার সংঘাত। "জয়ং দেহি" প্রার্থনা নিয়ে তারা ক্যালকাটা মাঠে এবং চতুর্দিকের মুক্ত এলাকাতে জমায়েত হয়েছিল। সে' জয়লাভ হয়েছে। চোখের সামনেই মোহনবাগান গড়ে তুলেছে সাফল্যের তাজমহল।

আনন্দের স্রোতে তারা এখন ভাসমান। জয়লাভের পর এখন তাদের মনে একটি ইচ্ছাই প্রবল হয়ে উঠেছে। বিজয়ী বীরদের তারা একবার কেবল কাছ থেকে চোখে দেখবে। এমন স্বপ্ন যারা সার্থক করেছেন তারা বড়ই আপনার জন। তাদের কাছ থেকে দেখে একবার নয়ন সার্থক করতেই হবে। তাই ভুলে গেছে তারা ঘরে ফিরে যাবার কথা।

ভুলে গেছে তারা সব কিছু। তাই খেলা শেষ হলেও মেলা ভাঙ্গে নি।

খেলা শেষ হল। জনতা উত্তাল হল, উদ্দাম হল। কিন্তু গৃহমুখী হল না তারা। জনতা জমেই রইল। অজানা, অচেনা লোক সব গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে সারাদিন দাঁড়িয়েছিল। তখন সকলের মনে একই কামনা হলেও একে অন্যকে চেনে না।

মোহনবাগান এখন অঘটন ঘটিয়েছে। জয়লাভের মাধ্যমে তারা "এক সূত্রে বাঁধিয়াছে সহস্র পরাণ।" বাঙ্গালী দল জিতেছে। সকলেই এ' অপার আনন্দের অংশীদার। এখন জানা-অজানা নেই, চলেছে গলাগলি, কোলাকুলি।

সকলের মনেই সদ্য জয়লাভের আনন্দ। সকলেই সে' আনন্দে আত্মহারা। তাই এখন আর পথ ভিন্ন নয়। সব পথই চলেছে শ্যামবাজার।

ফুলে ফুলে বোঝাই প্রকাণ্ড গাড়ীও হারিয়ে গেছে সে' জনতার মধ্যে। গাড়ী তাই চলেছে শম্বুক গতিতে। তবু সে' অবিশ্বাস্য ভীড়

এতক্ষণে ত্রি-স্রোতা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এক ধারা প্রবাহিত হয়েছে ধর্মতলা দিয়ে। সে' ধারা বোধ হয় এখন শ্যামবাজারেই পৌঁছে গেছে।

ভীড়ের চাপে সরে এসেই আর একটি প্রকাণ্ড ভীড়ের সৃষ্টি হয়েছে মনুমেণ্ট এবং এস্‌প্লানেড এলাকাতে। সে' ভীড়ের লোক উপছে পড়েছে চৌরঙ্গীতে। আশ্চর্য! তারা যেন আজ এ' সংরক্ষিত এলাকাটি জবর-দখল করে বসেছে। বিকালে এবং সন্ধ্যাবেলা অন্য দিন চৌরঙ্গী এবং এস্‌প্লানেডে থাকে সাহেব মেমদের মেলা। নেটিভ, নিগারেরা সে' সময়ে সাহস করে সেখানে প্রায় প্রবেশই করে না।

আজ সেখানে মানুষ আর মানুষ। এবং সকলেই ভারতীয় কালা আদমি। একটিও সাদা মুখ নেই। কোথায় যে গেল সব?

তাদের খোঁজের প্রয়োজন নেই। পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত শকট আসছে অমর একাদশকে নিয়ে। ভীড়ের তৃতীয় অংশ চলেছে সাথে সাথে। সামনে জনতা, পিছনে জনতা, ডাইনে এবং বায়ে জনতা নিয়ে আসছে চার-ঘোড়ার গাড়ী।

আসছে ধীরে ধীরে, অত্যন্ত মন্থর গতিতে।

বিজয়ী মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়েরা সকলেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়ীতে। শিবদাস আছেন হাতজোড় করে। জয়যাত্রা বটে, কিন্তু উপভোগ্য কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। রণক্ষেত্রের শ্রান্তি ও ক্লান্তি তাদের সর্বাঙ্গে তখনও জড়িয়ে আছে। কোথায় একটু গা এলিয়ে আয়াস করবে। তা নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। জনপ্রিয়তার অপরিহার্য মাশুল দিচ্ছে।

তার উপর মুগ্ধ দর্শকদের পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনে তারা আরো বিব্রত। কেমন করে সামলাবে এত মালা? চারদিক থেকে উড়ে আসছে ফুলের মালা; পড়ছে চোখে, মুখে এবং গলাতে। গাড়ীতে তাদের কোমর-

সমান প্রায় উঁচু হয়ে স্তূপীকৃত হয়েছে ফুলের মালা। হাতে জমেছে অসংখ্য মালা এবং গলার মালাতে তাদের মুখ প্রায় ঢেকে যাবার জোগাড়। তবু মাল্যদানের বিরাম নেই।

গাড়ী এসে প্রবেশ করল ধর্মতলাতে। আটকা পড়ল মোড়ের মসজিদের সামনে। সেখানে এক মস্ত বড় ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে জমায়েত হয়েছে আশে পাশের মুসলমানেরা। তাদের ব্যাণ্ড যাবে গাড়ীর সামনে সামনে, এই তাদের আরজি। জনতা খুশী মনে মঞ্জুর করল সেই আরজি। গাড়ীর ঠিক সামনেই স্থান করে দেয়া হল সেই ব্যাণ্ড পার্টিকে। গাল ফুলিয়ে তারা বাজাতে লাগল বিলাতী কুচকাওয়াজের উত্তেজক সুর। গাড়ী চলল এগিয়ে।

গাড়ী চলল ধর্মতলা দিয়ে। বিকাল বেলার চাঁদনি ও ধর্মতলা তখন ভীষণ কর্মব্যস্ত অঞ্চল। দু' দিকের দোকানীরা তখন থাকেন কেনাবেচাতে মশগুল। ভীড় থাকে পথে এবং দোকানে। আজ কিন্তু অন্য চেহারা। অসামান্য ভীড় বটে, কিন্তু লাভ লোকসানের কচকচি নেই। এ' মুহূর্তে সকলেরই পরমার্থ লাভ হয়েছে। কাজেই সামান্য অর্থচিন্তা তাদের মনে নেই। দোকান ফেলে দোকানী এসে দাঁড়িয়েছে পথে। সুর মেলাচ্ছে সকলের সঙ্গে, "জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।"

শ্যামবাজার পর্যন্ত সমস্ত পথে এ' একই দৃশ্য। তাই ময়দান থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পৌঁছুতেই সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে। গাড়ী ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল সন্ধ্যাদীপ। বাজল শাঁখ, শোনা গেল উলুধ্বনি।

বাংলার মেয়েদের নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনা দিয়েই হল বিজয়ী মোহনবাগানের প্রথম ঘরোয়া অভ্যর্থনা। মায়ের স্নেহে, বোনের আদরে অভিষিক্ত হল বাঙ্গালীর প্রাণের দুলালেরা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারেও জমে উঠেছিল এক প্রকাণ্ড ভীড়। তাদের সহর্ষ কলরবে সম্বর্ধিত হল এ' শোভাযাত্রা। দু' পাশের বাড়ীগুলি থেকে হল পুষ্পবৃষ্টি এবং লাজ বর্ষণ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল এখানেই। কিন্তু এমন আনন্দ উৎসবে অন্ধকারের কোন স্থান থাকতে পারে না। যাদু মন্ত্রে জ্বলে উঠল শত শত গ্যাসের বাতি এবং হ্যাজাক লণ্ঠন। ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চল আলোতে ঝলমল করে উঠল। রাত্রি বটে, কিন্তু নেই রাতের অন্ধকার।

রোশনাই, কেবল রোশনাই। এমনি করে সারা পথ—কলেজ ষ্ট্রীট, কালীতলা, হেদুয়া হয়ে শোভাযাত্রা শেষ হল এসে শ্যামবাজারে।

এ' অপরূপ দৃশ্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়েছেন গণেন মল্লিক। (অমৃতবাজার পত্রিকা ৩১.৭.১১)। বলেছেন তিনি, "বিজয়ী বীরেরা চলেছে এগিয়ে। সমস্ত পথ জয়ধ্বনিতে মুখরিত। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবর্ণনীয় আনন্দ প্লাবন। এমনি করেই তারা এসে পৌঁছুল শ্যামবাজারে শ্রীযুক্ত শৈলেন বসুর বাড়ীতে।"

"শেষ হল জয়যাত্রা। শুরু হল ঘরোয়া অভ্যর্থনা। কোথায় বা গেল জয়তিলক, কোথায় বা গেল পুষ্পমাল্য। খেলোয়াড়দের সোজা কাঁধে চাপিয়ে আরম্ভ হল নাচানাচি, মাতামাতি।"

কালীতলাতে কিন্তু শোভাযাত্রা আবার আটকা পড়েছিল।

চার ঘোড়াতে টানা গাড়ীর সামনে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়ালেন এসে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কালীতলা মন্দীরের পূজারী তিনি। নিবেদন করলেন, "কাল সারা রাত জেগে মায়ের পূজা করেছি। মুঠো মুঠো রাঙা জবা পায়ে দিয়ে মার করুণা প্রার্থনা করেছি। প্রসন্না হয়েছিলেন মা, তাই মোহনবাগান বিজয়ী হয়েছে। এখন খেলোয়াড়দের নির্মাল্য গ্রহণ করতেই হবে।"

দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ী।

হাজার হোক বাঙ্গালীর ছেলে! আশীর্বাদে বিশ্বাসের অভাব থাকলেও অভিশাপের ভয় আছে বিলক্ষণ। নিজেরাই গাড়ী দাঁড় করাল।

ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন, হাতে কমণ্ডলুতে শান্তি বারি, তামার টাটে রক্ত চন্দন। ৺সুধীর চ্যাটার্জি ছিলেন গাড়ীর একেবারে বাম পাশে। কেউ কিছু বুঝবার পূর্বেই সে' ব্রাহ্মণ সর্বাগ্রে তাকেই তিলক পরিয়ে দিলেন। ৺সুধীর বাবু অবনত মস্তকে গ্রহণ করলেন এ' আশীর্বাদ।

নীলমাধব ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। একটু পরিহাসপ্রিয়ও বটে তিনি। ঠনঠনে মন্দিরের সামনে এসে তিনি গাড়ীতে বসে থাকতে নারাজ। সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম না করলে তার যে মহাপাতক হবে। নেমে পড়লেন গাড়ী থেকে। সঙ্গে সঙ্গে টেনে নামালেন হাবুলবাবুকে। কানে কানে বললেন, "বাঁচা গেল। গাঁটে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। মাকে প্রণাম করে একটু হাত পা ছড়িয়ে নেয়া যাবে।"

অন্য খেলোয়াড়েরাও বাঙ্গালী ঘরের ছেলে। কালীতলার জাগ্রত কালীকে প্রণাম না করলে তারাও শান্তি পাবে না। সুতরাং সকলেই নামলেন। কালীতলার মন্দিরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সকলেই "মা, মাগো" বলে প্রণাম নিবেদন করলেন। সকলের কপালে মনের আনন্দে তিলক পরালেন পূজারী ব্রাহ্মণ।

৺কেবো-দা শুনিয়েছিলেন এ' কাহিনী।

৺হাবুল সরকারের প্রসন্ন প্রশ্রয়ে সে' সন্ধ্যাতে ৺কেবো-দা নাকি ঠিক চার ঘোড়ার গাড়ীর পিছনেই জায়গা করে নিয়েছিলেন সেই ভীড়ে। তিনি নিজের চোখে এ' ঘটনা দেখেছিলেন। বহুদিন পরেও

তার মুখে এ' কাহিনী শুনে আমার সত্যই বড় ভাল লেগেছিল। বাঙ্গালীর জীবনের একটি দিক বড় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে এ' গল্পটিতে।

এমনি করেই সে' শোভাযাত্রা এক সময় এসে গন্তব্যে পৌঁছুল। পৌঁছুল এসে শ্যামবাজারে। সেখানে ইতিমধ্যেই কলিকাতা ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু এখন আসছে আরো লোক, লোক আসার আর বিরাম নেই। কলিকাতার লোক এক মন, এক প্রাণ হয়ে চলেছে শ্যামবাজারে।

সমস্ত কলিকাতা এক অভূতপূর্ব আনন্দ প্লাবনে প্লাবিত, আলোতে আলোময়। বাইরের আলোতে উজ্জ্বল, মনের আলোতে উদ্ভাসিত। কেবল চৌরঙ্গী অঞ্চল সেদিন সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ। আজ হয়ত কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু কথা সত্য। রঙ্গই হোক, আর ব্যঙ্গই হোক, সেদিন সত্যই কিন্তু সাহেবপাড়া অন্ধকার।

সাহেবপাড়া যে অন্ধকার, সাহেবরা যে মাঠে পরাজয়ের পর কালো ঘোমটাতে মুখ ঢেকেছেন তা' কিন্তু সে মধুর সন্ধ্যাতে বা আলোকোজ্জ্বল রাতে জনসাধারণের চোখে পড়েনি। চোখে পড়েনি বলে যে সেখানে অন্ধকার ছিল না, এমন ভাবলে ভুল হবে। চোখে পড়েনি কারণ সেই সন্ধ্যাতে বা রাতে কেউ সাহেবপাড়া মাড়ায়নি। জনসাধারণ তখন নিজের আনন্দেই বিভোর; অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার মত সময় তাদের নেই।

সে' সন্ধ্যাতে অবশ্য চৌরঙ্গীর ভীড়ে একটিও সাহেব মেম দেখা যায় নি। সেদিন তারা সান্ধ্যভ্রমণে বার হয় নি। কিন্তু তখন কে তাদের খোঁজ করেছে? সাহেবরা হেরেছে, জনসাধারণের বহু দিনের সাধ মিটেছে। আর তাদের কথা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই।

ভারতীয় সমাজের এমন অবাধ, অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাসের কিন্তু তীব্র প্রতিঘাত হয়েছিল সাহেবদের মনে। যত উত্তাল আনন্দ

ভারতীয়দের মনে ততই গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন সাহেবদের মন। খেলাতে পরাজয়কে সুস্থ মনে তারা মেনে নিতে পারলেন না। তাই সত্যই তারা অন্ধকারে আত্মগোপন করে অশৌচ অবলম্বন করলেন।

এ' সমস্তই প্রকাশ পেল দিন দুই পরে।

*　　*　　*　　*

ইতিমধ্যে কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত মোহনবাগানের এ' জয়লাভকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

বুদ্ধিজীবি সমাজ এখন নবান্নের উৎসবে মেতে উঠেছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশের সমস্ত সংবাদপত্র এখন ভারতীয় দলের প্রশংসা এবং প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আনন্দের এমন ব্যাপক অভিব্যক্তি ইতিপূর্বে বৃটিশ ভারতে আর কখনও দেখা যায় নি।

সুদূর ১৯১১ সালে ভারতে জন-সংযোগের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। বিমান চলাচল নেই, বেতার নেই, নেই দূরপাল্লার টেলিফোন। বড় বড় সংবাদপত্র বলতেও তেমন কিছু নেই। কোন সংবাদপত্রেরই সর্ব-ভারতীয় প্রচার নেই। আঞ্চলিক জনপ্রিয়তাই তখন তাদের মূলধন।

তবু মোহনবাগানের বিজয়বার্তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। দেশের মধ্যেই কেবল ছড়িয়ে পড়ল না। দেশের সীমান্ত পেরিয়ে সাত সাগর তের নদী অতিক্রম করে সে' সংবাদ বিদেশেও পৌঁছুল। চমক লাগাল সেখানেও। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় সংবাদ ইংলণ্ডবাসীর মনে এমন শ্রদ্ধার উদ্রেক করে নি।

স্বাভাবিক ভাবেই কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিই বিশেষ ভাবে

প্রশস্তি মুখর হয়ে উঠল। নানা মতের নানা কাগজ। বিভিন্ন প্রকারের আদর্শ বা স্বার্থ নিয়ে তাদের কারবার। মতের মিল তাদের মধ্যে খুবই কম। কিন্তু সব সংবাদপত্রই মোহনবাগানের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ হলেন। একটিও ব্যতিক্রম নেই। তারা এ' অসামান্য কীর্তি স্থাপনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাদের চোখের সামনেই ঘটছিল জনসাধারণের সেই আনন্দের বিস্ফোরণ। সে' আনন্দে নিশ্চয়ই তারাও ছিলেন অংশীদার।

ব্যতিক্রম একটিও ছিল না, এ' কথা বোধ হয় সর্বৈব সত্য নয়। ভারতীয় সংবাদপত্রের কাছ থেকে মোহনবাগান পেল প্রচুর সম্মান। কিন্তু বেসুরো গাইলেন ইংলিশম্যান। এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেট্সম্যানও। তাতেই প্রকাশ পেল কিন্তু সাহেবপাড়া অন্ধকারের মত রসাল সংবাদ।

সে' কথা বিশদ করেই বলব একটু পরে। বুদ্ধিজীবি সমাজের অভিনন্দনের পালা আগে শেষ করি। জনসাধারণের অন্তরের অন্তরতম থেকে উৎসারিত আনন্দ প্লাবনে বাংলা ও বাঙ্গালী তখন আত্মহারা। সংবাদপত্রগুলি এবং সমাজের উঁচু তলার লোকেরা এখন সে' আনন্দের সামিল হলেন। সকলে এক বাক্যে এ' ঐতিহাসিক শীল্ড জয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন।

এ' অসামান্য কীর্তি ভারতের গৌরব, ভারতীয়ের গৌরব বলে তারা মুখরিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করলেন। বিদেশীরাও মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন, কিন্তু মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে কিছু কিছু পিঠও চাপড়ালেন। তাদের চোখে সব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল খেলার মাঠে এমন অকল্পনীয় জনতার উপস্থিতি। লক্ষাধিক লোক এবং তাদের এমন আনন্দের প্রকাশ—বিস্ময়ে অবাক হল বিলাতের সংবাদপত্রগুলি।

উত্তর ভারতে এলাহাবাদের "পাইওনিয়র" এবং পশ্চিম ভারতে

"টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া" তখন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংবাদপত্র। "পাইওনিয়র" (৩১.৭.১১) "কলিকাতাতে ফুটবল; বাঙ্গালী দলের আই, এফ, এ চ্যালেঞ্জ শীল্ড জয়" শিরোনামা দিয়ে বললেন,

"মোহনবাগান এবং ইষ্ট ইয়র্কস দলের মধ্যে আই, এফ, এ চ্যালেঞ্জ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা দেখতে যে বিশাল জন-সমাগম হয়েছিল ভারতের ফুটবল ইতিহাসে তা' পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। খুব কম করেও মাঠে ছিল এক লাখ লোক।"

"এসেছিলেন সকলেই খেলা দেখার উদ্দেশ্যে, কিন্তু অধিকাংশই খেলার কিছু দেখতে পায়নি। আই, এফ, এ অবশ্য কিছু অতিরিক্ত আসনের বন্দোবস্ত করেছিল, কিন্তু তার একটিও খালি ছিল না। দু' টাকার আসনের জন্য লোক হাসিমুখে দিয়েছিল পনর টাকা।"

এ' কিন্তু একেবারেই নূতন খবর। কলিকাতার কোন সংবাদপত্রে এমন খবর প্রকাশিত হয়নি। টুল, টেবিল এবং বাক্‌সওয়ালারা ফলাও ব্যবসা করেছিল, এ' সংবাদ তারা ছেপেছিলেন। একটি সিদ্ধ আলু এক পয়সা এবং একটি পান এক আনা—এ' খবরও তারা পরিবেশন করেছিলেন। এ' পশ্চাদপটে দু' টাকার টিকিট পনর টাকাতে বিক্রি হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

"পাইওনিয়র" আরো লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীরা এসেছিল দলে দলে। সুখের কথা খেলাটি চ্যারিটি হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জনতার ব্যবহার ছিল সংযত। বিশেষতঃ বাঙ্গালী দর্শকের আচরণ ছিল ভদ্রজনোচিত।"

"খেলাটিতে খুব উচ্চ মানের ফুটবল দেখা গিয়েছিল। ইষ্ট ইয়র্কস দল তাদের সুনাম অনুযায়ী নৈপুণ্য প্রকাশ করে। সৈনিক দলই প্রথম গোল করেছিল এবং তখন ইষ্ট ইয়র্কস দলের সমর্থকদের হর্ষধ্বনি শোনা গিয়েছিল এক মাইল দূর থেকে।"

"দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান মরিয়া হয়ে লড়তে থাকে এবং দশ

মিনিটের মধ্যেই পরিশোধমূলক গোলটি করে। তখন একটানা গগন-ভেদী চীৎকারে বাঙ্গালী দর্শকদের গলা ধরে গেল। খেলা শেষ হবার মিনিট দুই পূর্বে মোহনবাগান দ্বিতীয় গোলটি করলে যে দৃশ্যের অবতারণা হল তার বর্ণনা দুঃসাধ্য।"

"এ'ভাবে একটি বাঙ্গালী দল ১৯১১ সালের আই, এফ, এ চ্যালেঞ্জ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। সকলেই মেনে নিয়েছেন যে যোগ্যতর দলই এদিন জয়লাভ করেছে। ইষ্ট ইয়র্কসের ন্যায় শক্তিশালী দলকে হারাতে মোহনবাগানকে খেলতে হয়েছে চমৎকার। মোটামুটি খেলাটিও হয়েছিল খুবই পরিচ্ছন্ন।"

৩১শে জুলাই এর 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া' লিখলেন, "ক্যালকাটা মাঠে ফৈজাবাদের ইষ্ট ইয়র্কস এবং মোহনবাগান দলের মধ্যে আই, এফ, এ চ্যালেঞ্জ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলাটিতে মোহনবাগান ২-১ গোলে বিজয়ী হয়েছে। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় দল এই শীল্ড প্রতিযোগিতার চরম পর্যায়ে খেলবার সম্মান পায় নি বলে এ' খেলাটিকে ঘিরে উত্তেজনার সীমা ছিল না।"

"কারো মনেই সৈনিক দলের সাফল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দৃঢ়তা ও দক্ষতাপূর্ণ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের সাহায্যে মোহনবাগান তাদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। উপযুক্ত দল হিসাবেই তারা বিজয়ী হয়েছে।"

ঘরের কাগজ অমৃতবাজার পত্রিকা (৩১. ৭. ১১) "অমর একাদশ" আখ্যা দিয়ে সম্পাদকীয় লিখে বললেন, "গত শনিবার অসামান্য ক্রীড়া-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যারা পশ্চিম ভূখণ্ডের লোকের চোখে নিজেদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই মোহনবাগানের অমর একাদশের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। মোহন-বাগানের জয় আমাদেরও জয়।"

"যারা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন

তাদের জন্য আমরাও গর্বিত। তিনটি শ্রেষ্ঠ সৈনিক দলের বিরুদ্ধে একাদিক্রমে বিজয়ী হওয়া সামান্য কৃতিত্ব নয়।...এই জয়লাভের পশ্চাতে যে বৃহত্তর সত্য আছে তার প্রতিও আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

অমৃতবাজার পত্রিকার সর্বশেষ মন্তব্যটির ইঙ্গিত সম্যক বুঝতে বর্তমান পাঠকদের একটু অসুবিধা হতে পারে। তখন বৃটিশ সরকার সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীদের গ্রহণ করতেন না। বাঙ্গালীর হাতে বন্দুক তুলে দিতে বৃটিশেরা ভয় পেতেন। কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তাই তারা বলতেন যে বাঙ্গালী "সমর বিমুখ" (non martial) জাত বলেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাদের স্থান নেই। অমৃতবাজারের তদানীন্তন সম্পাদক মোহনবাগানের জয়ের সূত্রে এখন সুযোগ পেয়েছেন। তাই তিনি একটি সমর-বিমুখ বাঙ্গালী দলের হাতে তিন তিনটি জাঁদরেল সৈনিক দলের পরাজয়ের পশ্চাতে যে বৃহত্তর সত্য আছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এ' মন্তব্যের দিকে সরকারের চোখে পড়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ' মন্তব্য লণ্ডন "টাইম্স" এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

"দি মুসলমান" তখন কলিকাতার একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র। তারা ছিলেন মুসলিম স্বার্থের এবং সমাজের মুখপাত্র। যদিও তখন হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ তেমন প্রকট হয়ে ওঠে নি তবু বৃটিশ ভেদ-নীতির কল্যাণে এ' দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও দ্বেষের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু মোহনবাগানের এ জয়লাভ উপলক্ষে "দি মুসলমান" স্পষ্ট বললেন, "এ' জয়ের আনন্দ ছিল সার্বজনীন...মোহনবাগানের জয়লাভে মোসলেম স্পোটিং ক্লাবের সভ্যরা আনন্দে মাতাল হয়ে গেলেন। হিন্দু ভাইদের এ' জয়লাভে তারা ডিগবাজী খেলেন, মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন।"

"দি বেঙ্গলির" তদানীন্তন সম্পাদক ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

"দি বেঙ্গলি" লিখলেন, "বাঙ্গালী দলের এই অপূর্ব জয়লাভে শুধু ভারতীয় সমাজের লোকেরা আনন্দে আত্মহারা হলেন না। মাঠে মোহনবাগানের খেলা দেখে বহু ইউরোপীয়ানও মুগ্ধ হয়েছিলেন।" "ক্যাপিটাল" বলেছিলেন, "মোহনবাগানের এ' জয়লাভ দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম এবং সাধনার ফলশ্রুতি।"

বাংলা দৈনিক ছিল না তখন কিন্তু কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা মাসিক পত্র ছিল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র "মানসী"তে লিখেছিলেন, "দশ বৎসর পূর্বে স্বপ্নেও এ' জিনিস কল্পনা করা যেত না। মোহনবাগান আজ সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে"। "প্রবাসী" মন্তব্য করলেন, "অন্য সকলের ন্যায় আমাদেরও আনন্দ হয়েছে, কিন্তু এ' জয়লাভে আমরা বিস্মিত নই।···কিন্তু যারা মাঠের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন তাদের সম্বন্ধে আমরা কেবল বলতে চাই যে তাদের চিন্তাধারাতে বিন্দুমাত্র সংযম নেই।"

"মর্ডার্ন রিভিউ" শুনিয়েছিলেন কঠিন সত্য কথা। "বীরত্ব ও সঙ্ঘবদ্ধতার ক্ষেত্রে আমরা আরো মহত্তর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম— এ' বিশ্বাস যখন আমাদের আছে তখন সামান্য একটি ফুটবল খেলার ফলাফলে আনন্দে আত্মহারা হব কেন?

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ছাড়াও বিলাতে ডেইলি মেল, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ান এবং টাইম্‌স মোহনবাগানের জয়লাভ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। তার মধ্যে লণ্ডন 'টাইম্‌স' এর বিবরণই সর্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

লণ্ডন টাইম্‌স (৩১.৭.১১) "ভারতে এসোসিয়েশন ফুটবল: ভারতীয় দলের জয়লাভ" হেডিং দিয়ে নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ পরিবেশন করে লিখেছিলেন,

"একটি ভারতীয় দল—নাম তার মোহনবাগান—ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের চ্যালেঞ্জ শীল্ডের খেলাতে উপর্যুপরি রাইফেল ব্রিগেড,

মিডলসেক্স ও ইষ্ট ইয়র্কস সৈনিক দলকে পরাজিত করেছে। চরম পর্যায়ের খেলাতে মোহনবাগান ২-১ গোলে ইষ্ট ইয়র্কস দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে।"

"এই অভূতপূর্ব সাফল্যে শনিবারে অনুষ্ঠিত এ' খেলাটিতে জনতার মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। বাংলার সংবাদপত্রগুলি এ' জয়লাভ বাঙ্গালী জাতির শৌর্য ও বীর্যের স্বাক্ষর বহন করছে বলে দাবী তুলেছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকার বৃহত্তর সত্যের ইঙ্গিত লণ্ডন টাইম্‌সের চোখ এড়িয়ে যায় নি।

বলেছিলেন টাইম্‌স, "আশী হাজার বাঙ্গালী এদিন মাঠে উপস্থিত হয়েছিল। অধিকাংশেরই খেলা দেখার কোন সুযোগ হয় নি। ঘুড়ি উড়িয়ে তাদের খেলার ফালফল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা হয়েছিল।"

"ইষ্ট ইয়র্কস দলের পরাজয়ের সংবাদ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী দর্শকেরা গায়ের জামা ছিড়ে নিশান তৈরী করে আনন্দে নাচতে থাকেন। মাঠে জাতি বিদ্বেষের কোন চিহ্ন দেখা যায় নি। সাহেবরা খুশি মনেই পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরাও পরাজিত দলকে বাহবা দিয়েছেন।"

বাঙ্গালী দলের সর্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড জয়, উপর্যুপরি তিনটি সৈনিক দলের পরাজয়, জাতি বিদ্বেষের অভাব এবং মাঠে অভূতপূর্ব জনতার উপস্থিতি—এ' সমস্তই বুদ্ধিজীবি সমাজের চোখে পড়েছিল। ভারতের এবং বিলাতের সংবাদপত্র সমূহে মোহনবাগানের সাফল্যকে কেন্দ্র করে এ' সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হয়েছিল।

উপর্যুপরি তিন তিনটি সামরিক দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয়লাভকে প্রাধান্য দিয়ে "টাইম্‌স" প্রথমেই সে কথার উল্লেখ করেছিলেন। তারা মনে প্রাণেই উপলব্ধি করেছিলেন যে এক

কোকিলের ডাকের বসন্ত এ' নয়। নেহাৎ পচা শামুকে পা কাটা অথবা বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেড়া নয়। তারা বুঝেছিলেন যে ভারতীয় ফুটবল এখন সাবালক হয়েছে।

মাঠে আশী হাজার দর্শকের উপস্থিতিতেও টাইম্‌স চঞ্চল হয়েছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালীই এদিন মোহনবাগানের সামিল হয়েছিল এবং সাহেবদের হার কামনা করেছিল এ' কথা তারা বুঝতে পেরেছিলেন। এ' বিশাল জনতার মনে খেলার চেয়ে অনেক বড় প্রেরণা ছিল, এ' সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে "টাইম্‌স" এর দেরী হয় নি। সবই ঠিক বুঝেছিলেন 'টাইম্‌স' কিন্তু জাতি বিদ্বেষের অভাব সম্বন্ধে তাদের ধারণা বোধহয় সম্পূর্ণ ঠিক ছিল না।

দর্শকদের মধ্যে সেদিন জাতি বিদ্বেষের কোন চিহ্ন ছিল না, এ' কথা সত্য। কিন্তু "সাহেবরা খুশি মনেই পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন" এ' উক্তি মোটেই সত্য নয়। কলিকাতার ইঙ্গ সমাজ এবং সাহেবি মালিকানার সংবাদপত্রগুলি মোহনবাগানের এ' জয়লাভ মোটেই সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইঙ্গ সমাজ অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিলেন। ইঙ্গ সমাজের মুখপাত্র ইংলিশম্যান এবং ষ্টেট্‌সম্যান ব্যাজ-স্তুতি মাত্র করেছিলেন।

চৌরঙ্গী পাড়াতে সেদিন জমাট বাঁধা অন্ধকার দেখে সাহেবরা অশৌচ অবলম্বন করেছেন বলে একটি ভারতীয় সংবাদপত্র মন্তব্য করেছিলেন। কোন সংবাদপত্র এমন অপ্রিয় সত্য কথা বলেছিলেন তার কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। কিন্তু কেউ কিছু বলেছিলেন ঠিকই। নইলে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইংলিশম্যান এ' সমালোচনার প্রতিবাদের প্রয়োজন অনুভব করতেন না। ইংলিশম্যান এমন জোর প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই সাহেবপাড়া অন্ধকারের অভিযোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। কথায় বলে, চোরের মায়ের বড় গলা।

"একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতা" আখ্যা দিয়ে ইংলিশম্যান (৩১.৭.১১) সম্পাদকীয় মন্তব্য করলেন,

"গত শনিবার ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন শীল্ড প্রতিযোগিতার চরম খেলাতে যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে ইতিপূর্বে ভারতে অনুষ্ঠিত কোন ফুটবল খেলাতে তা' দেখা যায় নি। একে সহজেই ইংল্যাণ্ডের এফ, এ কাপ ফাইন্যালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। লণ্ডনের সমতুল্য জনতা হয়ত এখানে দেখা যায় নি, কিন্তু বাংলার নেটিভদের নিকট ফুটবল যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এ' বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।"

"মোহনবাগান নামক একটি বাঙ্গালী দলের ফাইন্যালে উপস্থিতিই বোধ হয় এমন অভূতপূর্ব উদ্দীপনার প্রকৃত কারণ। মোহনবাগানের কপালের জোর এখন প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তবু কেবল ভাগ্যের জোরেই মোহনবাগান ফাইন্যালে উঠেছে এমন কথা বলা ঠিক হবে না। মোহনবাগান ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েই চরম পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল।"

"শেষ খেলাতে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ছিল ইষ্ট ইয়র্কস। একটি বৃটিশ সামরিক দল অবতীর্ণ হয়েছে একটি বাঙ্গালী দলের বিরুদ্ধে। এ' কারণেই খেলাটি শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ ধারণ করল। উৎসুক এবং উত্তেজিত দর্শকেরাও দ্বিধা বিভক্ত হয়েই নিজ নিজ দলকে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।"

প্রতিযোগিতার সূচনাতে ইংলিশম্যানের চোখে মোহনবাগান 'বাবু' দল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। রাইফেল ব্রিগেড দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় পর্যায়ের খেলাতে বিজয়ী হবার পরেও ইংলিশম্যান বাঙ্গালী দল বলে মোহনবাগানকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ ছিলেন। তখন ইংলিশম্যান সজোরে বলছিলেন যে মোহনবাগান বাঙ্গালী দল নয়, সর্ব-ভারতীয় দল।

এখন অবশ্য ঘাড় ছেড়ে পায়ে হাত দিয়েছেন ইংলিশম্যান। শুধু পায়ে হাত নয়; ইংলিশম্যান এখন মোহনবাগানের পায়ে গড়াগড়িই দিচ্ছেন। অভিনন্দন জানাচ্ছেন মোহনবাগানকে বাঙ্গালী দল হিসাবে।

মুখবন্ধের পর ইংলিশম্যান বলছেন, "খেলাটিতে মোহনবাগান জিতেছে ২-১ গোলে। এ' সম্মানজনক জয়লাভের জন্য বাঙ্গালী দলটিকে অভিনন্দিত করতেই হবে। শীল্ড প্রতিযোগিতার উনিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একটি বাঙ্গালী দল শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। যোগ্যতর দলই যে জয়লাভ করেছে সমস্ত ক্রীড়া রসিকেরাই তা' স্বীকার করবেন।"

সাধু! সাধু!

মোহনবাগানকে বার বার বাঙ্গালী দল বলে এখন মুখে খই ফোটাচ্ছেন ইংলিশম্যান। তার উপর আবার অভিনন্দনও জানাচ্ছেন। মাঠের কিল হজম করতেই হবে। নিরুপায় হয়েই ইংলিশমানের এ' পরিবর্তন।

তবে এ' সব নিতান্তই মামুলি মুখের কথা; অন্তরের কথা নয়। বিজয়ী দল সম্বন্ধে সকলকেই এমন কথা বলতে হয়। বাধ্য হয়েই মোহনবাগানকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ইংলিশম্যান। তাই বলে গাত্র দাহ হবে না? কতক্ষণ মুখোস পরে থাকবেন এবং কতক্ষণই বা মনের দুঃখ চেপে রাখবেন? তাই প্রাথমিক ভদ্রতার দেঁতো হাসি হেসে সেই দাঁতেই বসালেন কামড়।

নিজ মূর্তি ধারণ করে সেই সম্পাদকীয়তেই ইংলিশম্যান লিখলেন, "এ' ফাইন্যাল খেলা এবং তার পূর্ববর্তী খেলাগুলি নিয়ে কিন্তু ক্রীড়াজগতের নীতি (?) এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সমালোচকেরা অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেছেন। বাংলার

'জনমতের' প্রতিনিধি একটি সংবাদপত্রের ধারণা যে ভারতীয় দলের এমন জয়লাভে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ এবং সংবাদপত্রসমূহ বুঝি সম্পূর্ণ অশৌচ অবলম্বন করেছেন।"

সেই সন্ধ্যাতে আলোকে আলোকিত শ্যামবাজারের উলটো দিকে সাহেবপাড়া এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলের কালো ঘোমটা ঢাকা চেহারা দেখেই বোধ হয় একটি ভারতীয় সংবাদপত্র এই মন্তব্য করেছিলেন। শোকে আমরা পরি সাদা কাছা; সাহেবরা ধারণ করেন কালো পোষাক। সেই সন্ধ্যাতে সাহেবপাড়াকে এমন কালো দেখে হয়ত কোন নেটিভ কাগজ মনে করেছিলেন যে সাহেবদের অশৌচ হয়েছে। স্বাভাবিক সন্দেহ মাত্র প্রকাশ করেছিলেন এ' ভারতীয় সংবাদপত্র।

বুকে শক্তি শেল বিদ্ধ হল ইংলিশম্যানের। রাবণের শক্তি শেলে পতন হল লক্ষ্মণের। রামচন্দ্র সীতার উদ্ধার এবং রাবণ বধের কথা বিস্মৃত হয়ে ভাই ভাই বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। ইংলিশম্যানের হল সেই দশা।

কাঁদুনি গাইতে আরম্ভ করলেন। বিলাপ করে প্রলাপ বকলেন, "গত শনিবার খেলোয়াড়েরা যে প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সে' সম্বন্ধে অবহিত হলে এবং খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান অর্জন করলে এ' সমস্ত সমালোচকেরা ভাল করেই বুঝতে পারতেন যে খেলোয়াড়ের মনে শোক প্রকাশের বা অশৌচ অবলম্বনের কোন স্থান নেই। অশৌচ ধারণ দূরের কথা; আমাদের ধারণা যে সমস্ত ইংরাজই ভারতীয় দলের এ' জয়লাভকে স্বাগত জানাবেন।"

ভণ্ড ইংরাজের ভণ্ডামির সীমা নেই।

প্রতিবেশী ফরাসীরা ইংরাজের কথা উঠলেই বলেন, "Perfidious Albion"; সাদা বাংলাতে যস্যার্থ, "ভণ্ড ইংরাজ।" ফরাসী দেশে কথাটি প্রায় প্রবাদের মত চালু। যারাই ইংরাজের সংস্পর্শে এসেছেন তারাই তাদের চরিত্রের এ' গুণটির কথা জানেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ শুনে এক বৃদ্ধ সর্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ ?" সর্দারজী প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে আহত হয়ে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

তাকে জানান হল, "ইংরাজ-ফরাসী মিত্রশক্তি লড়ছে অক্ষশক্তি জার্মেনি এবং ইতালীর বিরুদ্ধে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সর্দারজী বললেন, "আফশোষ কি বাত।"

তার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে খেদোক্তি করে বললেন সর্দারজী, "ফরাসী হারলে তুনিয়াতে সৌন্দর্য চর্চা থাকবে না। জার্মেনি হারলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সমূহ ক্ষতি হবে।"

"আর যদি ইংরাজ হারে ?"

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন সর্দারজী, "ইংরাজ হারলে তামাম তুনিয়া থেকে ভণ্ডামী ও বেইমানি লোপ পাবে।"

ক্রীড়া রসিকের মনে শোক প্রকাশ বা অশৌচের কোন স্থান নেই জেনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে টেষ্ট ক্রিকেটে অ্যাসেজের জন্ম বিবরণ।

অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্টে পরাজয়ের পর খোদ ইংলণ্ডের মাঠেই ক্রিকেটের শবদাহ করে সেই অ্যাসেজের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য ইংলিশম্যান বলতে পারেন যে, কফিনে করে যখন ব্যাট ও ষ্টাম্প কবর দেওয়া হয় নি তখন তা' বোধহয় শোক প্রকাশ ছিল না। ইংল্যাণ্ডবাসীদের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নেই এমন কথা বলা চলবে না। তাই মনে হয় সেদিন বোধহয় ওভাল মাঠে ইংরাজ পুঙ্গবেরা আনন্দে বহ্নি-উৎসবই করেছিলেন। ইংলিশম্যান আজ বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন ভাল।

সেদিনের ইংলিশম্যান কিন্তু তারপর ইংরাজ প্রশস্তি গেয়ে জোর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "খেলাধূলাকে ইংরাজরা সকল সময়েই মৈত্রী স্থাপনের হাতিয়ার বলে মনে করে এসেছে। যেখানেই

ইংরাজরা গিয়েছেন সেখানেই খেলাও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন এবং স্থানীয় লোকদের হাতে কলমে সেই খেলা শিখিয়েছেন।"

ধরে নিলাম কলিকাতার সাহেব সমাজ কালো ঘোমটার আড়ালে হাসি মুখেই ভারতীয় দলের এ' জয়লাভকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু অভিনন্দন জানিয়েও ইংলিশম্যানের আক্ষেপের শেষ নেই। উচ্চ গ্রামে বিলাপ করে বললেন, "বিলাতে ফুটবল খেলা হয় শীতকালে, কিন্তু এদেশে ফুটবল খেলার সময় যে আবহাওয়া থাকে তা' ইংরাজদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অজ্ঞান সমালোচকদের এ' কথা মনে রেখে ভারতীয় দলের নগ্নপদে খেলার অসুবিধা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।"

এবারে ইংলিশম্যানের বিজ্ঞ সমালোচক বলেছেন কথার মত একটি কথা। আমাদের দেশে ফুটবল খেলা হয় গ্রীষ্মের শেষে এবং ভরা বর্ষাতে। তখন মাঠ কখনও জলসিক্ত, কখনও কর্দমাক্ত এবং কখনও বা পঙ্ক-কুণ্ড। খালি পায়ে দাঁড়ানই যায় না মাঠে। তবু ইংলিশম্যান বলছেন যে নগ্নপদে খেলার কোন অসুবিধা আছে এমন কথা বলা উচিত নয়।

ইংলিশম্যান বোধ হয় এ' কথাই বলতে চাইছেন যে শীত ও বরফের দেশের লোকেরা দারুণ গরমে খেলেছেন বলেই হয়ত মোহনবাগানের নিকট হেরেছে। হবেও বা। কিন্তু শীত-বরফের দেশের নব্বুই মিনিটের খেলাকে সাহেবদের সুবিধার দিকে নজর রেখে এ' দেশে পঞ্চাশ মিনিটের খেলাতে পরিণত করা হয়েছে। এ' কথা বোধ হয় সে'দিন ইংলিশম্যানের মনে পড়ে নি।

কাঁদুনির উপসংহারে কিন্তু ইংলিশম্যান বলতে ভুললেন না, "খেলার মাঠে বৃটিশদের ঐতিহ্য সর্বত্র সম্মানিত। তা'ছাড়া আমরাই ভারতীয়দের হাত ধরে এই খেলা শিখিয়েছি। আমাদের নিজস্ব খেলাতে তাদের উৎকর্ষে আমাদের আনন্দিত না হবার কোন কারণ নেই।"

ইংলিশম্যান শোনালেন, "পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্" এর ইংরাজী ভাবার্থ। ব্যাজ স্তুতি আর কাকে বলে ? তবে গুরুদেবরা এমন ভাবেই প্রশংসা জানিয়ে থাকেন। যেমন জানিয়েছিলেন ১৯১১ সালের ১লা আগষ্টের ষ্টেট্‌সম্যান।

"মোহনবাগানের চমকপ্রদ জয়লাভে" বলেছিলেন সেদিনের ষ্টেট্‌সম্যান, "ভারতীয় সমাজে আনন্দের বান ডেকেছে। ইংরাজ সমাজও কিন্তু এ' সাফল্যে কম খুশী নয়।"

তারা এত খুসি যে গোপন ব্যথা প্রশমনের উপায় খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্চেন। অনেক ভেবে চিন্তে তারা বললেন, "ফুটবল খেলাতে পৃথিবীতে যাদের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব সেই ইংরাজেরা কি মানের ফুটবল খেলে তা' প্রত্যক্ষ করবার জন্য অচিরেই মোহনবাগান দল একবার ইংলণ্ডে যাবে বলে আমরা আশা পোষণ করছি।"

ষ্টেট্‌সম্যানের এ' আশার ছলনা যে কত গভীর তা' তদানীন্তন লোকের বোধগম্য হল না। তখন সাহেবরা গালাগাল দিলেও তাদের নজরে পড়েছে বলে কিছু লোক খুসি হত। তাদের মনের ভাব হল, "রাজা বলেছে শ্যালা, গলায় পরেছে মালা।" তাই মোহনবাগান ইংলণ্ডে যাবে, ষ্টেট্‌সম্যানের এ' আশা প্রকাশের সঙ্গে জনসাধারণের মন ময়ূরের মত নাচতে আরম্ভ করল।

সে' সময়ে স্বর্গ ছেড়েও ইংলণ্ডে যাবার লোক প্রচুর ছিল এ' দেশে। এ' প্রস্তাবে হইচই পড়ে গেল। তারা ভাবলেন যে বিলাতের সাহেবদের মোহনবাগানের খেলা দেখিয়ে অবাক করে দেবার জন্যই বুঝি ষ্টেট্‌সম্যান এ' প্রস্তাব তুলেছেন। এ "উলটো বুঝলি রাম" লোকদের জন্য এখন হয়ত সকলেরই করুণা হবে। সেদিনের সামাজিক অবস্থাতে কিন্তু এই ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

শীল্ড সংগ্রামে মোহনবাগান তিনটি সামরিক দলকে পরাজিত করেছে। লণ্ডন "টাইম্‌স" এর নজর পর্যন্ত এ' দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

বাঙ্গালীদের বুক গর্বে ভরে উঠেছে। তারা এ' নিয়ে বড্ড বড়াই করছে। সাহেবদের পক্ষে তা' সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাইফেল ব্রিগেড, মিডল্‌সেক্‌স এবং ইষ্ট ইয়র্কসকে মোহনবাগান হারিয়েছে সত্য। কিন্তু চুনোপুটিদের হারিয়েই ফুটবলে সাহেবদের পরাজিত করেছি এমন দাবী বাঙ্গালীরা করবে কেন ?

ষ্টেট্‌সম্যানের গাত্রদাহ হতেই পারে।

তাই ষ্টেট্‌সম্যান এমন 'বিষ কুম্ভম্ পয়োমুখম্' হয়ে উঠেছেন। তাই মোহনবাগান ইংলণ্ডে যাবে এমন আশা প্রকাশ করছেন। বন্যরা নাকি বনেই সুন্দর। সেই সৌন্দর্য দেখে প্রেরণা লাভের জন্য মোহনবাগানকে এখন বনে যেতে হবে। ইংলণ্ড অবশ্য বন নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই শীত ও বরফের দেশ। তবু, ইংলণ্ডে যাবার সাধু প্রস্তাব কেন ?

কি হবে সেখানে গেলে ? সেদিনের কলিকাতার লোকেরা সে' প্রশ্ন তুলেছিলেন কি না জানি না। ষ্টেট্‌সম্যান কিন্তু স্পষ্টই বলেছিলেন যে ইংলণ্ডে গেলে মোহনবাগানের চোখ খুলে যাবে। তখন তারা দেখতে পাবেন…

"সেখানে গেলে তারা দেখতে পাবেন," হক কথা শোনালেন ষ্টেট্‌সম্যান, "ভারতে অবস্থিত সৈনিক দলগুলি প্রশংসনীয় ফুটবল খেললেও খোদ ইংলণ্ডে যে মানের খেলা হয় সে' তুলনাতে সৈনিক দলের ক্ষমতা কিছুই নয়। ভারতের মাঠে মোহনবাগান সাহেবদের যে খেলা দেখেছে তার চেয়ে অনেক, অনেক উচ্চ মানের খেলা তারা দেখতে পাবেন ইংলণ্ডে। সে' খেলা দেখলে মোহনবাগানের নিজেদেরও খেলার অনেক উন্নতি বিধান হবে।"

এত কথা বললেন ষ্টেট্‌সম্যান; খালি উহ্য রাখলেন যে সেখানে খেললে প্রত্যেকটি খেলাতে নাজেহাল হবে মোহনবাগান। তখন তৃপ্ত হয়ে ইঙ্গসমাজ উচ্চারণ করবেন, "ওঁ মধু! ওঁ মধু!"

ভারতীয় দলের জয়লাভে তারা শোকচিহ্ন ধারণ করে নি, তাদের মনে কোন আক্ষেপ নেই এবং তাদের আনন্দেরও কোন অভাই নেই। তবু মোহনবাগানকে ইংলণ্ডে প্রেরণের শুভ ইচ্ছা কেন? ইংলণ্ডের ফুটবল মান যে খুব উচ্চ এ' কথা মোহনবাগান কখনও অস্বীকার করে নি। তা'ছাড়া, মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের সঙ্গে বিলাতের ফুটবল মানের সাক্ষাৎ সম্পর্কই বা কি? তবু কেন এমন তির্যক ইঙ্গিত?

বুঝহ সুবোধ জন, যে জান সন্ধান।

হাজার হোক, ভারতীয় ফুটবলের নবান্ন উৎসব। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই বিধেয়।

বুদ্ধিজীবি হলেই যে কেবল কথার কচকচি করতে হবে এমন কোন অলিখিত আইন নেই। তাদের দীর্ঘায়িত নবান্ন উৎসবে অচিরেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে বুদ্ধিজীবিদের রসিক হতেও কোন বাধা নেই। ভোজন-রসিক, কলা-রসিক এবং অন্যান্য প্রকারেও রসের পূজারী হতে পারেন তারা।

আই, এফ, এ শীল্ডের অধিষ্ঠান হয়েছিল শ্যামবাজারে ৺শৈলেন বসুর বাড়ীতে। এ' বসু পরিবার বাংলার বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার। তারা পরদিন করলেন এক বিরাট ভোজের আয়োজন। সঙ্গে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। রসের ছড়াছড়ি; ভোজন রসের সঙ্গে সঙ্গীত নাটকের রস।

রসজ্ঞানের পরিচয় দিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার গণেন মল্লিকও। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি অবলম্বন করে তিনি লিখলেন, "শ্রীযুত বসু করলেন এক বিরাট ভোজের আয়োজন। খেলাতেও যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভোজন ব্যাপারেও অমর একাদশ তাই দেখালেন। ভাদুড়ী ভাই দু'জন পাতলা, রোগা। দেখলে মনে হত যেন উপবাসী ব্রাহ্মণ। উপবাসী না হলেও ব্রাহ্মণ ত নিশ্চয়ই। আপ্ত বাক্যের মর্যাদা পরিপূর্ণ রক্ষা করে ভোজনে এ' দুই বিপ্র নাচ দেখালেন বটে।"

"ভুরি ভোজনের পর বিশ্রাম ও আরাম। গান শুনলেন, ম্যাজিক দেখলেন। ম্যাজিক দেখালেন স্বর্গত রাজা বোস। তারপর সারা রাত জেগে খেলোয়াড়েরা আদি আর্য সারস্বত নাট্য সমাজের নিবেদিত যাত্রা গান শুনলেন। পালা ছিল "ভীষ্ম বিজয়।"

জনসাধারণের নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে আগেই; শেষ হল বুদ্ধিজীবি সমাজের অভিনন্দন। কিন্তু কলিকাতার আকাশে বাতাসে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মোহনবাগানের নাম। এ' নাম ভাঙ্গিয়েও পয়সা কামাবার লোকের অভাব হল না।

মোহনবাগান নামের যাদু নিয়ে প্রচার কার্য চালালেন ব্যবসায়ীরা। একটি ভারতীয় সংবাদপত্রের ৩১শে জুলাই এর সংস্করণের সঙ্গে ৫৯, হ্যারিসন রোডের স্ট্যাণ্ডার্ড সাইকেল কোম্পানী বিজয়ী মোহনবাগান দলের সুন্দর হাফটোন ছবি সাধারণের মধ্যে বিতরণ করলেন। এ' ছবির আরো এক লক্ষ কপি তারা পরে বিনামূল্যে বিতরণ করে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করলেন।

৭৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে ছিল মেসার্স হাল্ড এণ্ড চ্যাট (হালদার এণ্ড চ্যাটার্জি) কোম্পানী। তারা প্রস্তুত করতেন হারমোনিয়ম। তারা ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় দলের শীল্ড বিজয় উপলক্ষে দু'মাস পর্যন্ত শতকরা দশ টাকা কম দামে তারা এই বাদ্যযন্ত্র বিক্রী করবেন। এস, রায় এণ্ড কোম্পানী ছিল খেলার সাজসরঞ্জামের দোকান। তারা বিজ্ঞাপন দিলেন, "মোহনবাগান দলের খেলোয়াড় হতে চেষ্টা করুন। আমাদের বল দিয়ে খেলুন—চার টাকা থেকে বারো টাকার মধ্যে ভাল বল পাবেন।"

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয়েছিল ৯।৩ বিডন ষ্ট্রীটস্থ দি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের একটি দেয়ালপত্র। এ' থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তখন তাদের নূতন নাটক "বাজী রাও" মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। তারা জনসাধারণকে জানালেন, "মোহনবাগান আই, এফ, শীল্ড জিতেছে, বিজয়ী হয়েছে বাজী রাও।"

অতঃপর শুরু হল মোহনবাগান দল এবং ব্যক্তিগত ভাবে খেলোয়াড়দের নিয়ে টানাটানি। পাড়াতে বাস করেন মোহনবাগান দলের একজন খোলোয়াড়, সুতরাং পাড়ার লোক এগিয়ে এলেন তাঁকে সম্মান দেখাতে। সব খেলোয়াড়দের নিয়েই এ' মাতামাতি। তারা পড়লেন মুশকিলে। এ' আদরের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তারা ৺শৈলেন বসুর শরণাপন্ন হলেন। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ লোক ছিলেন ৺শৈলেন বসু। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, "যারাই নিমন্ত্রণ করতে আসবেন তাদের আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। একটি নিমন্ত্রণও নিজ দায়িত্বে তোমরা গ্রহণ করবে না।" বেঁচে গেল খেলোয়াড়েরা।

কিন্তু শ্রীশ (হাবুল) সরকার ধরা পড়লেন ফাঁদে।

সোমবার, ৩১শে জুলাই, তিনি যথারীতি অফিসে গিয়ে যোগ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের একজন কর্মী। লক্ষ্য করলেন, সবাই যেন সেদিন তাকে একটু সমীহ করছে। সরকারের আরো মন হল সবাই যেন কি বলাবলি করছে, কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলছে না। আশ্চর্য হলেন, কিন্তু ঘাড় গুঁজে জায়গাতেই বসে রইলেন।

বেলা তখন তিনটা হবে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের খাস আরদালি এসে নিবেদন করল, "সাহেব সেলাম দিয়া।" কলম ফেলে উঠলেন হাবুলবাবু। চললেন সাহেবের কামরার দিকে।

মিঃ ম্যাডক্স ছিলেন তখন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। নিজ কক্ষের দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে সরকারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সরকার আসতেই মিঃ ম্যাডক্স আগে হাত বাড়িয়ে হাণ্ডশেক করে বললেন, "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স।" হাবুলবাবু "থ্যাঙ্কস" বলার আগেই মিঃ ম্যাডক্স তার পিঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। দু'জনের আর কোন কথা নেই।

হাবুলবাবুকে সঙ্গে করে মিঃ ম্যাডক্স একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে পা দিয়েই হাবুলবাবু স্তম্ভিত। ঘর ভরতি লোক, উঁচু প্লাটফর্মের উপর টেবিল এবং এক দিকে দুটি চেয়ার। ফুলদানিতে ফুল এবং সামনে টেবিলের উপর দুটি মালা।

মিঃ ম্যাডক্স তাকে ধরেই প্লাটফর্মে উঠে একটি চেয়ারে বসলেন এবং পাশের চেয়ারটিতে বসিয়ে দিলেন হাবুলবাবুকে। কে একজন এগিয়ে এসে সভাপতি মিঃ ম্যাডক্সকে মাল্যভূষিত করলেন। তিনি অন্য মালাটি নিয়ে পরিয়ে দিলেন হাবুলবাবুর গলাতে।

উপস্থিত সকলে হাততালি দিল। হাবুলবাবু একেবারে চুপ।

পরদিন ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ (১. ৮. ১১) সংবাদ দিলেন, "মোহনবাগান দলের খেলোয়াড় শ্রীশচন্দ্র সরকার কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের কর্মী। গতকাল গুণমুগ্ধ সহকর্মিরা আই, এফ, শীল্ড জয়ে তার প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণের জন্য সরকারকে একটি সোনার চেন উপহার দিয়েছেন। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ ম্যাডক্স নিজে চেনটি সরকারের হাতে অর্পণ করেন।"

যা হবার তা' হয়ে গেল। কিন্তু হাবুল সরকার শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য অপরাধী হতে রাজী নন। বিকালেই গিয়ে শৈলেন বসুকে তিনি সব কথা খুলে বললেন এবং সোনার চেনটিও শ্রী বসুর হাতে দিলেন।

শ্রী বসু কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর ডাকলেন, "শিবে, এদিকে আয়।" শিবদাস এলে হারটি তার হাতে দিয়ে শ্রী বসু একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন। শিবদাস সমস্ত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল করে চেনটি আবার হাবুল সরকারের গলাতে পরিয়ে দিলেন।

এ' সুন্দর কাহিনীটিও ৺ কেবো-দার কাছে শোনা।

অতঃপর আসতে আরম্ভ করল সমাজের উঁচু মহল থেকে আমন্ত্রণ। সে' আমন্ত্রণের আর বিরাম নেই। সকলেই মোহনবাগানকে অভি জ্ঞাপন করতে চান। সম্মানিতকে সম্মান জানিয়ে সকলেই ধন্য হতে

চান। কিন্তু এত নিমন্ত্রণ রক্ষা অসম্ভব। একজনকে বাদ দিয়ে অপরের নিমন্ত্রণ গ্রহণও সমীচীন নয়। জনপ্রিয়তার দাবী মেটাতে মোহনবাগানের আপত্তি নেই, কিন্তু অনাবশ্যক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টিও তাদের কাম্য নয়।

তা' ভিন্ন খেলার মাঠে অর্জিত জয়লাভকে কেন্দ্র করে খেলার মাঠের বাইরে সম্বর্ধনার এ' প্রকার আতিশয্যে কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিব্রতই বোধ করেছিলেন। গত্যন্তর না দেখে মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারী ষ্টেট্‌সম্যানে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়ে এ' সমস্ত আমন্ত্রণ গ্রহণে অক্ষমতা জানালেন। সবিনয়ে তিনি নিবেদন করলেন,

"আমরা এত লোকের কাছ থেকে এমন সাদর আহ্বান পেয়ে সত্যই কৃতজ্ঞ ও অভিভূত। কিন্তু এই নিমন্ত্রণের ক্ষুদ্র একটি অংশ গ্রহণ করাও আমাদের সাধ্যের বাইরে। খেলোয়াড়দের একাগ্রতা, অনুশীলন এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছাতে খেলাতে আমাদের জয়লাভ হয়েছে। এ' নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কিছু হলে খেলোয়াড়েরা সকলেই এবং আমরাও বিব্রত বোধ করব। আশা করি, আমাদের অনিচ্ছাজ্ঞাপক অনুরোধের মর্যাদা রক্ষিত হবে এবং কেউ আমাদের ভুল বুঝবেন না।"

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—উপনিষদের এই শিক্ষা ভারতবাসীর রক্তে। মোহনবাগানও ভারতীয় দল। তাই ত্যাগ করে ভোগ করার ঐতিহ্যকেই সম্মান করল মোহনবাগান।

এ' ত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হল, অক্ষয় হল মোহনবাগানের জীবনে। তাই মোহনবাগান প্রেম আজ বাঙ্গালীর ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। মর্যাদা পেয়েছে যুগে যুগে সম্মানিত উত্তরাধিকারের।

মোহনবাগান প্রীতির সূচনা হয়ত হয়েছিল আরো আগেই। কিন্তু সেই প্রীতি প্রেমের প্লাবনে রূপায়িত হল ১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই। সেদিন থেকেই মোহনবাগান হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীর মনের

আনন্দ, প্রাণের আরাম। এ' প্রেম অক্ষয়, অমর। যতদিন বাঙ্গালী আছে, ততদিন মোহনবাগানও আছে।

সেই অপরূপ সন্ধ্যাতে অপূর্ব আনন্দ প্লাবনে অভিষিক্ত বাঙ্গালী মোহনবাগানের উদ্দেশ্যে মনে-প্রাণে বলেছিল, "তোমারি চরণে আমারি পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসী।"

সেই বন্ধন অটুট, অচ্ছেদ্য, জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।

"অচ্ছেদ্যোয়ম্...অক্লেদ্যোশোষ্য চ।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা)

* * * *

আমার কথাটি ফুরালো ; নটে গাছটি কিন্তু মুড়ালো না।

১৯১১ সালের মোহনবাগানের কথা আমার আর কিছু বলার নেই। মোহনবাগানের অসামান্য জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধান করতে করতে পৌঁছেছিলাম অতীতের একটি স্মরণীয় দিনের মর্মস্থলে। সেদিন জন-মানসে যে অভূতপূর্ব আনন্দ বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার তথ্যভিত্তিক চিত্র আমি তুলে ধরেছি।

এ' প্রয়াসে অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মোহনবাগানের একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মৌন অতীত মুখর হয়েছে। সেই আশা এবং নিরাশা, সংগ্রাম ও সাফল্য এবং সর্বশেষ সেই অকল্পনীয় আনন্দ উচ্ছ্বাস বর্তমান যুগে ক্রীড়া-রসিকের মনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তারা হয়ত তাদের সম্মানিত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছেন।

সেদিন থেকেই বাঙ্গালীর বড় আপন হয়ে উঠেছে মোহনবাগান। আজও মোহনবাগান তাই বাঙ্গালীর এমন প্রিয়।

সেই জয়লাভের মধ্যে বাঙ্গালী পেয়েছিল এক নূতন উদ্দীপনা। সেদিন বাঙ্গালী দেখেছিল তাদের বহু ব্যর্থতার পশ্চাদ্পটে সার্থকতার এক তাজমহল। তারা প্রত্যক্ষ করেছিল বিদেশী ইংরাজের প্রথম

পরাজয়। ফিরে পেয়েছিল লুপ্তপ্রায় আত্ম-সম্মান বোধ। হৃদয়ের গভীরতম গভীরে উপলব্ধি করেছিল যে ইংরাজ অপরাজেয় নয়। তাদেরও পদানত করা সম্ভব। মোহনবাগান সত্যই পদে আনত করেছিল একটির পর একটি ইংরাজ সৈনিক দলকে।

স্থান এবং কাল সেই অনুভূতিকে রূপায়িত করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গালী জীবনে এসেছিল এক অদ্ভুত আলো। পশ্চিমের ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালী তখন নূতন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। তাই মোহনবাগানের জয়লাভে বাঙ্গালী সেদিন এমন রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তাদের চোখে সে' জয়লাভ ছিল বৃহত্তর ও মহত্তর জয়লাভের পথে প্রথম সবল ও সার্থক পদক্ষেপ।

এ' সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপরেই যথা সম্ভব আলোক পাতের চেষ্টা করেছি। তবু মনে হচ্ছে বর্তমান যুগের পাঠকের মনে আরো কিছু অনুচ্চারিত প্রশ্ন আছে। এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন সমাজ-বিজ্ঞানী ডক্টর আশিস নন্দী এম, এ; পি, এইচ, ডি।

অশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান আশিস শুধু পণ্ডিত নয়, ক্রীড়া-রসিকও। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন এবং সমাজ বিজ্ঞানীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন। পরে এ' প্রশ্ন নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তারা সকলেই এ' সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সেই প্রশ্নের জবাব বাকী। তাই আমার কথা ফুরোলেও নটে গাছটি মুড়োয় নি।

তদানীন্তন সামাজিক অবস্থাকে কেন্দ্র করেই ছিল সমাজ বিজ্ঞানীর প্রশ্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জীবনে রেঁনেসার জোয়ার এসেছিল। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান শতাব্দীর-সূচনাতে সেই রেঁনেসার প্রধান ধারক ও বাহক ছিল বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শ্রীমান আশিস জানতে চেয়েছিলেন যে রেঁনেসার মত

মোহনবাগানের সেই ঐতিহাসিক জয়লাভও একই পথে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাত ধরেই এসেছিল, কি না ? তিনি আরো ইঙ্গিত করেছিলেন যে সমাজের স্তর বিন্যাসের পটভূমিতে মোহনবাগানের সে' বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা ভিন্ন এ' প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য আর কোন সমাধান নেই।

এ' প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন নয়। সমাজ চেতনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে খেলার মাঠের ঘটনাকে বিচার করার প্রবণতা সর্বত্রই আছে। এমন বিচার কিন্তু ভ্রমাত্মক কারণ ক্রীড়াক্ষেত্রের গুরুত্ব যাই হোক সেখানেও সমাজ চেতনার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ডের যতদিন সমৃদ্ধি ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল ততদিন ফুটবলে ও ক্রিকেটে তারা ছিল দিগ্বিজয়ী। আজ তাদের স্থান কোথায়? অলিম্পিক গেম্‌সে স্বর্ণপদকের সিংহ ভাগ নিয়ে মারামারি এবং কাড়াকাড়ি চলে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোবিয়েৎ রাশিয়ার মধ্যে।

কোন খেলোয়াড়ই তার নিজস্ব সমাজের বাইরের জীব নয়। সমাজ জীবনে যদি তখন রেঁনেসার প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে তাহলে খেলার মাঠেও অল্পবিস্তর তার প্রতিফলন ঘটবেই। বাঙ্গালী সমাজে লাগল রেঁনেসার জোয়ার। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা হলেন তার ধারক ও বাহক। সেদিন খেলার মাঠেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। মোহনবাগানের দলের খেলোয়াড়েরা সকলেই ছিলেন এ' সমাজের প্রতিনিধি।

মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের জন্ম হল ১৮৮৯ সালে। প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী হয়েছিলেন যথাক্রমে ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং ৺যতীন্দ্রনাথ বসু। এক বছর পর নাম পরিবর্তন করে আত্মপ্রকাশ করল বর্তমানের মোহনবাগান এথেলেটিক ক্লাব। ১৮৯৫ সালে মোহনবাগানের সেক্রেটারী হলেন ৺ জে, এন, মিত্র এবং আরো ভিন্ন

বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে সেক্রেটারী হলেন ৺স্যার বি, এন, মিত্র। ৺শৈলেন্দ্রনাথ বসু সেক্রেটারী হলেন ১৯০০ সালে এবং ১৯১১ সালে আই, এফ, এ শীল্ড জয়ের সময়েও ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব তারই হাতে।

ক্লাবের জন্ম থেকে কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত (১৮৮৯-১৯০০) ক্লাব সংগঠন এবং পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যারা এমন সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন তারা প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি, সুতরাং তারা ছিলেন বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি সমাজের প্রকৃত প্রতিভূ।

আর্থিক শ্রেণী বিন্যাসের বিচারে তারা ছিলেন মধ্যবিত্ত। হয়ত সর্বোচ্চ মধ্যবিত্ত, কিন্তু তবু মধ্যবিত্ত। রাজা নয়, জমিদার নয়, শিল্পপতিও নয়। তারা সকলেই ছিলেন একেবারে নির্ভেজাল বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত এবং তারাই হাত ধরে এবং পথ দেখিয়ে মোহনবাগানকে নিয়ে গিয়েছিলেন যশের শিখরে। সুতরাং মোহনবাগান ক্লাবের গৌরবে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি এবং মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান অনস্বীকার্য।

সে' সময়ে ফুটবল খেলা বর্তমানের মত জনপ্রিয় নয়। ব্যাঙের ছাতার মত ক্লাব অবশ্য গজিয়ে উঠছে অনেক, কিন্তু খেলছে প্রধানতঃ স্কুল এবং কলেজের ছেলেরা। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনাতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজই ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাই ফুটবলও তখন ছিল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের খেলা।

মোহনবাগান ক্লাবের তদানীন্তন কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯১১ সালে যে দল গঠিত হয়েছিল তাদের সকলেই ছিলেন সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সার্থক প্রতিনিধি। কেউ কলেজের ছাত্র, কেউ কেরানী, কেউ অধ্যাপক এবং পরবর্তী জীবনে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়েছিলেন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধির বাইরে ১৯১১ সালের মোহনবাগান দলে

একজনও ছিলেন না। ভূতি সুকুল এবং বিজয়দাস ভাদুড়ী ভিন্ন আর সকলেই ছিলেন বুদ্ধিজীবি। সুকুল ও বিজয়দাস দুজনে মিলে চালাতেন ছোট্ট একটি দোকান।

অপূর্ব গৌরবে এবং চিরস্থায়ী সৌরভে মোহনবাগানকে সেদিন যারা সমৃদ্ধ করেছিলেন একটি ভারতীয় সংবাদপত্র তাদের "অমর একাদশ" বলে সম্মান দিয়েছিলেন। কালের করাল গ্রাসে কিন্তু সেই অমর একাদশের মধ্যে একজনও আজ মরলোকে নেই। আছে শুধু তাদের মৃত্যুহীন প্রাণ এবং মধুময় স্মৃতি। ফুলের বুকে গন্ধের মত সে স্মৃতি জুড়ে আছে, জড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মনে।

আজ সে' সব বীর খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার উপায় নেই। মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সকলের চরিত্রেই। তারা ছিলেন সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ। নিজের ঢাক নিজে কখনই পিটাতেন না। অপূর্ব কীর্তি স্থাপনের অধিকারী হয়েও সে' গৌরব সম্বন্ধে তারা ছিলেন একেবারেই উদাসীন। আর, সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সমসাময়িক ক্রীড়া-সাংবাদিকেরাও ছিলেন নীরব ও নিস্পৃহ।

আজ তাই সেই "অমর একাদশ" সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে বিশদ করে আলোচনা করা যাবে না। তারা কে ও কি ছিলেন এ' সম্পর্কে সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। তবু আমার পরম সৌভাগ্য যে সেই ঐতিহাসিক দলের সাতজনের সঙ্গে তাদের পরিণত বয়সে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় হয়নি কেবল সুকুল, নীলমাধব এবং মনোমোহন এর সঙ্গে।

হাবুলবাবুকে একদিন একবার মাত্র দেখেছিলাম মোহনবাগান মাঠে। সেদিন চার মহারথী—হীরালাল মুখার্জি, সুধীর চ্যাটার্জি, জে, রায় (কানুবাবু) এবং শ্রীশ সরকার (হাবুলবাবু)—একসঙ্গে ছিলেন। কাছে গিয়ে সেদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম বটে, কিন্তু

অনুপস্থিত সাতজনের জন্য মন হায় হায় করে উঠেছিল। চোখে বোধ হয় জলও এসেছিল। খালি ভেবেছিলাম যদি এগার জনকেই একসাথে দেখতে পেতাম তাহলে চোখ সার্থক হত, জীবন ধন্য হত।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে এবং তাদের বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তার ভিত্তিতেই ১৯১১ সালের মোহনবাগান দলের সেই কীর্তিমান খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত নখ-দর্পণ চিত্র দিয়েই সেই "অমর একাদশ" এর উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

হীরালাল মুখার্জি (গোলরক্ষক) সফল শীল্ড অভিযানের সময় হীরালাল ২৫ বছরের যুবক। কলিকাতার ছেলে, শীর্ণকায় হীরালাল উচ্চতায় ছিলেন ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির মত। বেঁটে খাটো হলেও হীরালাল ছিলেন সাহসে দুর্জয়। সে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন ১৯১১ সালে মিড্‌ল-সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতে। সৈনিক দলের খেলোয়াড়েরা তাকে নিয়ে রাগবি খেলছে, কিন্তু হীরালাল ভিজে মাঠে বল আঁকড়ে পড়ে আছেন। গোল যখন হল তখন বলসহ গোলরক্ষককে গায়ের জোরে ঠেলে লাইন পার করা হয়েছে।


হীরালাল মুখার্জি

ক্রীড়া-জীবনের সূচনা হয়েছিল ন্যাশনাল এ, সিতে। এ'কথা হীরালালবাবু নিজেই আমাকে বলেছিলেন। কেমন করে মোহন-বাগানে এসেছিলেন সে' সম্বন্ধে তার সঠিক কিছু মনে ছিল না। তবে তিনি বলেছিলেন যে, সুধীর চ্যাটার্জিই বোধহয় তাকে মোহনবাগানে নিয়ে এসেছিলেন।

প্রথম যখন মোহনবাগানে এলেন তখন ১৮।১৯ বছর বয়স। ফুটবল খেলেন বটে, কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। গোলরক্ষক

হিসাবেও খেলেন ; হাফ-ব্যাক বা ফরোয়ার্ড হিসাবেও খেলছেন যখন তখন। শৈলেন বসুই সর্বপ্রথম হীরালালকে নিয়মিতভাবে গোলে খেলাতে আরম্ভ করেন। সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে শীঘ্রই ভারতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকরূপে স্বীকৃতি অর্জন করেন। দলের বিরুদ্ধে চাপের সৃষ্টি হলে হীরালালের খেলা খুলত কিন্তু অতর্কিত সটে তিনি প্রায়ই পরাজিত হতেন। তবু মোহনবাগান সমর্থকদের তার উপর প্রচুর আস্থা ছিল। তারা বলতেন, "ভয় নেই, হীরে গোলে আছে।"

হীরালাল ছিলেন সেই গোলরক্ষক যিনি শীল্ডের খেলাতে পেনালটি বাঁচিয়ে বলেছিলেন যে পেনালটি বেঁচে গেছে। নিরহঙ্কার, নিরভিমান এবং অমায়িক বাঙ্গালী।

নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ সন্তান হীরালাল ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা পাশের পর আর্থিক কারণে বি. এ. আর পড়া হল না। তার উপর তখন মেতে উঠেছেন ফুটবল নিয়ে। এ' সময়ে ৺স্যার রাজেন মুখার্জির আনুকুল্যে তিনি মার্টিন কোম্পানীর ইটখোলাতে চাকুরী পেয়েছিলেন। ইটখোলা থেকে ইট চালানের হিসাব নিকাশের ভার ছিল তার উপর। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত নাকি কাজ করতে হত তাকে। খেলা থাকলে অবশ্য অর্ধেক দিনের ছুটি পেতেন।

সামান্য চাকুরীতে সামান্য মাইনে নিয়েই হীরালালবাবুর জীবন কেটেছে। পরবর্তী জীবনেও আর্থিক স্বাচ্ছল্যের মুখ দেখেন নি তিনি। তবু হীরালাল কখনও নালিশ করতেন না। সর্বদাই একটি প্রসন্ন হাসি লেগে থাকত তার মুখে।

এ, সুকুল (রাইট ব্যাক) ঃ সুকুলের ভাল নাম কেউ বোধ হয় কখনও শোনেনি ; ভূতি সুকুল নামেই তিনি ছিলেন প্রিয় ও পরিচিত।

১৮৮৯ সালে কলিকাতাতেই সুকুলের জন্ম। মোহনবাগান ক্লাবের জন্মও এ' বছরেই। সুকুলের প্রপিতামহ উত্তর প্রদেশ থেকে কলিকাতাতে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। ১৯১১ সালে ২২ বছরের তরুণ ভূতি সুকুলের চার-পুরুষ কলিকাতাতে বাস। এই সুকুলের প্রতি ইঙ্গিত করেই ইংলিশম্যান বলেছিলেন যে মোহনবাগান বাঙ্গালী দল নয়, কারণ তাতে বহিবাংলার খেলোয়াড় আছে। সুকুল কিন্তু তখন ছয় বৎসর ধরে মোহনবাগানে খেলছেন।



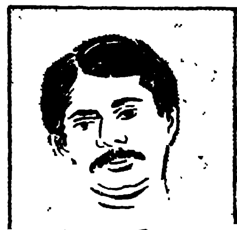
এ, সুকুল

চৌকা মুখ সুকুল দীর্ঘকায়, পেশীবহুল এবং শক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। সামরিক ও বে-সামরিক সাহেব দলের খেলোয়াড়েরা পর্যন্ত সুকুলকে সমীহ করে চলতেন। রাইট ব্যাকে কঠোর পরিশ্রম করে খেলতেন তিনি। পায়ে তার লম্বা এবং জোরাল সট ছিল। হেড করতেও সুকুলের বিশেষ পারদার্শিতা ছিল কিন্তু তার অবস্থানমূলক খেলাতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যেত। গোলরক্ষক হীরালাল পরিহাস করে বলতেন, "সুকুল সবাইকে সামলায়, আমাকে ডোবায়।"

সুকুল ছিলেন মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। মেসার্স সুকুল এণ্ড ভাদুড়ী নামে সুকুলের একটি ছোট দোকান ছিল। বিজয়দাস ভাদুড়ী সে' দোকানের অন্যতম অংশীদার ছিলেন।

সুধীর চ্যাটার্জি (লেফ্‌ট ব্যাক)ঃ বিশিষ্ট বাঙ্গালী খৃষ্টান পরিবারের সন্তান সুধীর চ্যাটার্জির জন্ম এই কলিকাতা সহরেই। ১৮৮৪ সালে তার জন্ম, সুতরাং এ' ঐতিহাসিক শীল্ড ফাইন্যালের সময় তিনি ২৭ বছরের পরিণত যুবক।

এম, এ পাশ সুধীর চ্যাটার্জি তখন ভবানীপুর এল্, এম্, এস কলেজের অধ্যাপক। সুধীরবাবুর বন্ধুরা এবং গুণমুগ্ধদের মধ্যে অনেকেই বলতেন, "সুধীর পড়াবার প্রফেসর নয়, খেলার প্রফেসর।" বালক বয়স থেকেই সুধীরবাবুর পাঠে এবং খেলাতে সমান অনুরাগ ছিল। সুধীর চ্যাটার্জি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র এবং ফুটবলে তার হাতে খড়ি সেখানেই। মোহন-বাগানের হয়ে খেলতে শুরু করেন। ১৯০৪ সালে।



সুধীর চ্যাটার্জি

সমসাময়িক সমালোচকদের মতে সুধীরবাবুই ছিলেন ১৯১১ সালের মোহনবাগান দলের দুর্বলতম সূত্র। লেফ্‌ট ব্যাকে খেলতেন, কিন্তু সুকুলের মত সটের জোর ছিল না বলে তার খেলা তেমন চোখে পড়ত না। কিন্তু লম্বা সটের ঘাটতি তিনি পুষিয়ে নিতেন চমৎকার অবস্থানমূলক খেলার সাহায্যে। দলের সঙ্কট কালে প্রায়ই তিনি ত্রাণকর্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করতেন। তিনিই ছিলেন দলের একমাত্র স-বুট খেলোয়াড়। পিছনে দাঁড়িয়ে দলের খেলার উপর সজাগ চোখ রাখতেন সুধীর চ্যাটার্জি। অধিনায়ক শিবদাসের গভীর আস্থা ছিল সুধীরবাবুর উপর।

মাঠে সুধীর চ্যাটার্জিকে সকলেই "লাকি" এবং "বাবু" বলে ডাকতেন। সব সময়েই ইস্ত্রি করা জার্সি ও প্যান্ট পরে সুধীর বাবু ছিমছাম হয়ে মাঠে নামতেন। এমনকি বুটও তিনি রং দিয়ে চকচকে পালিশ করতেন। এ'জন্যই বোধহয় সবাই তাকে "বাবু" বলতেন।

সুধীরবাবু যে 'লাকি' ছিলেন এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুধীর বাবু নিজেই আমাকে একবার বলেছিলেন যে, তিনি দলে যোগদানের পূর্বে মোহনবাগান কোন ট্রফি লাভ করে নি। মোহনবাগানের জীবনের

সর্বপ্রথম সাফল্য ১৯০৪ সালে কুচবিহার কাপ জয়। সুধীর চ্যাটার্জিও মোহনবাগানে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৪ সালে। এই কপাল জোরের জন্যই ছিল তার 'লাকি' খেতাব।

অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন সুধীর চ্যাটার্জি। বোধ হয় এ'কারণেই "এটা ত হল, ওটা কবে হবে?" প্রশ্ন নিয়ে সেই জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ এত লোকের মধ্যে তাকেই দর্শন দিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে অধ্যাপনা ছেড়ে সুধীর চ্যাটার্জি খৃষ্টান ধর্মযাজক (Priest) হয়েছিলেন।

মনোমোহন মুখার্জি (রাইট হাফ)ঃ উত্তরপাড়ার ছেলে মনোমোহনের জন্ম ১৮৮৩ সালে। আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতার সময় মনোমোহন বাবু ২৮ বছরের যুবক। মাত্র পাঁচ বছর ধরে ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা ছিল মনোমোহন বাবুর কিন্তু মোহনবাগান দলের রক্ষণ বিভাগে তখনই তিনি সম্মানিত স্থানের অধিকারী।


মনোমোহন মুখার্জি

মনোমোহন বাবুর শরীরে বিন্দু মাত্র মেদও ছিল না। ছিল মোটা হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হত তিনি বোধ হয় দুর্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ দমের অধিকারী ছিলেন মনোমোহন মুখার্জি। শ্রান্তি ক্লান্তি বোধ তার ছিল না। লোকে বলত যে মনোমোহন বাবু নাকি মাঝে মাঝে একদিনে দুটি খেলাতে অংশ গ্রহণ করতেন। এক মাঠ থেকে চলে আসতেন অন্য মাঠে।

জটলার মধ্য থেকে নিজস্ব কৌশলে মনোমোহন বাবু সকল সময়েই বল বার করে আনতেন। তাঁর খেলার আর একটি বিশেষত্ব ছিল যে, সুযোগ পেলেই তিনি এগিয়ে এসে ষষ্ঠ ফরোয়ার্ড হয়ে যেতেন এবং প্রয়োজন হলে ক্ষিপ্র গতির সাহায্যে আবার পিছিয়ে যেতেন।

রাইট আউট কানুবাবুর সঙ্গে তার সমঝোতা ছিল চমৎকার। কানুবাবুকে পরে অনেক বারই বলতে শুনেছি, "মনা আমাকে খাটিয়ে মারত।"

মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে মনোমোহন বাবু আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং কর্মজীবনে ছিলেন বাংলা সরকারের পি, ডবলিউ, ডি বিভাগের একজন করণিক।

সেই 'অমর একাদশের' অন্যতম একজন ভিন্নও মনোমোহন বাবুর আর একটি কীর্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তার পুত্র বিমল মুখার্জিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন। বিমল মুখার্জিও পিতার ন্যায় হাফ ব্যাকেই খেলতেন কিন্তু পিতার কৃতিত্ব অতিক্রম করে বিমল মুখার্জি হয়েছিলেন মোহনবাগান দলের সার্থক ফুটবল অধিনায়ক।

রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সেণ্টার হাফ)ঃ বিক্রমপুরের এ ছেলেটির ১৯১১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়স। আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।

বেঁটে খাটো চেহারা। দুটি চোখে তখনও তারুণ্যের দীপ্তি; গোলগাল কোমল মুখে নব-দুর্বাদলের মত কচি গোঁফের রেখা। সেণ্টার হাফে খেলার মত উপযুক্ত চেহারা ছিল না রাজেনবাবুর। তার উপর ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। তখন তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মাত্র তিন বৎসর ধরে খেলছেন মোহনবাগানে।


রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অভিজ্ঞতার অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিল স্বভাবসিদ্ধ কৃতিত্বের আড়ালে। খর্বতার জন্য সেণ্টার হাফে

খেলতে রাজেনবাবুর একটু অসুবিধা হত বটে। কিন্তু দুর্জয় সাহস, এবং অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে তরুণ রাজেন খেলতেন সমস্ত মাঠ জুড়ে। রক্ষণ কার্যে যেমন অসামান্য দৃঢ়তা, আক্রমণ বিস্তারেও ছিল তেমনই তৎপরতা। তার উপর লাফিয়ে উঠে সকলের মাথার উপর দিয়ে হেড করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

ইংলিশম্যান রাজেনবাবুকে একবার "টেরিয়ার" বলে বর্ণনা করেছিলেন। টেরিয়ার জাতীয় কুকুর একবার শিকারের পিছনে ছুটলে লেগেই থাকে। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে একবার উদ্যত হলে রাজেনবাবু হেস্তনেস্ত না করে ছাড়তেন না।

পরবর্তী জীবনে রাজেনবাবু কিছুদিনের জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রাজেনবাবুই বোধ হয় বাংলাতে খেলার ধারা বিবরণী প্রচারের পথিকৃৎ।

নীলমাধব ভট্টাচার্য (৫' ফ_ট হাফ)ঃ নদীয়া জেলার লোক নীলমাধব ভট্টাচার্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বামুন পণ্ডিতের ছেলের ফুটবল রোগ কেমন করে হল জানা নেই। তবে টোল ছেড়ে নীলমাধব বাবু পড়েছিলেন স্কুলে এবং পরে শ্রীরামপুর কলেজে। ফুটবল অনুরাগের কারণ বোধ হয় তাই।



নীলমাধব ভট্টাচার্য

১৯১১ সালে নীলমাধব বাবুর ২৫ বছর বয়স। প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি মোহনবাগানে এসেছিলেন এবং মোহনবাগানেও বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। খেলা ছিল তার সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। যাকে ইংরাজীতে বলে "ষ্টাইলিশ" তাই ছিলেন নীলমাধব বাবু। তাড়াহুড়ো নেই, ভুল পাশ দেয়া নেই এবং নেই অনাবশ্যক বল পায়ে রাখার প্রবণতা। প্রতিপক্ষের আক্রমণের ধাক্কা এবং

গতিপথ অনুমানে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং এজন্যই নীলমাধব বাবুকে অতিক্রম করে যাওয়া ছিল কঠিন।

হীরালাল বাবু, সুধীর বাবু এবং অভিলাষ বাবুর নিকট শুনেছি যে গৌরকান্তি সুপুরুষ নীলমাধব বাবুর নাকি কীর্তনের গলা ছিল চমৎকার। খেলার মাঠে কিন্তু তিনি একটু হই-চই করতেন। বোধ হয় নীলমাধব বাবুকে লক্ষ্য করেই ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ একবার মন্তব্য করেছিলেন যে শৈলেন বসুর দলের খেলোয়াড়েরা মাঠে বড্ড বেশি হাঁক ডাক করেন। খুব রসিক লোক ছিলেন নীলমাধব বাবু এবং খেলার সময়েও হাস্য পরিহাস করতে তার দ্বিধা ছিল না।

অভিলাষ বাবু একবার গল্প করে বলেছিলেন, "শিবদাস একটি খেলাতে গোল করার সুযোগ নষ্ট করলে নীলমাধব বাবু নাকি চেঁচিয়ে বলেছিলেন, "শিবে, এবার একটু শিঙে বাজা।" আর এক দিন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটি গোল হল। নীলমাধব বাবু নাকি পিছনে ফিরে জোরে জোরে বলে উঠলেন, "এ'কুল ও'কুল দু'কুল গেল, সুকুল এবার একটু খেল।"

ঠনঠনে কালীবাড়ীতে সেই বিরাট মিছিলের সময় নীলমাধব বাবু যা' করেছিলেন তাতেও মনে হয় যে স্বভাবতঃই বোধ হয় তিনি একটু পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মপ্রাণও ছিলেন। মোহনবাগানের প্রত্যেকটি খেলার দিন তিনি কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পূজো দিতেন। এ' কথা বলেছিলেন সুধীরবাবু এবং হেসে যোগ করেছিলেন, "মায়ের আশীর্বাদী ফুল নীলু আমারও কপালে ছোঁয়াত।"

কর্মজীবনে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ রায় (রাইট আউট)ঃ পোষাকী নামে কেউ বোধহয় তাকে চিনত না। সকলেরই তিনি প্রাণের "কানু"। শীল্ড অভিযানের

বিবরণে আমরা দেখেছি তখন জনসাধারণের মুখে কানু বিনে আর গীত নেই।

ঢাকার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলের ছেলে কানুবাবুর তখন ২১ বৎসর বয়স। প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কানুবাবু খেলা শিখেছিলেন ঢাকাতেই। কিন্তু বসন্তের সর্ব-সমর্পণ নিয়ে তার খেলা পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠল মোহনবাগানে যোগদানের পর।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি কানু বাবু একটু শ্রমবিমুখ ছিলেন। পায়ের কাছে বল না এলে তিনি বল ধরার চেষ্টাই করতেন না। কিন্তু বল ধরলেই কি অপূর্ব তার গতি, কিবা তার ভঙ্গিমা। ১৯১১ সালে অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়ে খেলেছিলেন কানুবাবু। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেছিলেন, "ভাদুড়ী ভাইদের পরই এবার মোহন-বাগানের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন কানু রায়। প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর মাঠে ডাক উঠছে, "কানু কানু"। কানু রায়ের খেলা দেখে এবার সকলেই মুগ্ধ।"



যতীন্দ্রনাথ রায়

তীব্র গতিবেগের উপর মাপা সেণ্টার করা ছিল কানুবাবুর খেলার বৈশিষ্ট্য। আর রামধনু (rainbow) আকারের সট করতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। এমনি একটি সটেই মিডল্‌সেক্‌স দলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলার দিন কানুবাবু পিগটকে পরাজিত করেছিলেন।

কানুবাবু কর্মজীবনে পুলিশ বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রমোশন পেয়ে পরে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সেও তিনি খেলার মাঠে আসতেন। তাকে শেষ দেখেছিলাম ১৯৫৮ সালে মোহনবাগান মাঠে। সঙ্গে ছিলেন ১৯১১ সালের দলের হীরালাল মুখার্জী, সুধীর চ্যাটার্জি এবং হাবুল সরকার।

শ্রীশচন্দ্র সরকার (রাইট ইন) : শ্রীশ সরকারের অবস্থাও যতীন রায়ের মত। শ্রীশ বাবু বললে কেউ তাকে চিনে না, কেউ তাকে জানে না। কিন্তু সকলেরই পরিচিত এবং অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন হাবুল সরকার।


শ্রীশচন্দ্র সরকার

শিবদাস এবং বিজয়দাস ভাদুড়ীর মত খেলোয়াড়দের সঙ্গে একত্র খেলা সত্ত্বেও হাবুল কখনও নিষ্প্রভ হতেন না। কখনও তাকে ক্ষীণ-দীপ্তি মনে হত না। হাবুল সরকারের পায়ের কেরামতিও ছিল খুব সুন্দর এবং সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে এগিয়ে গিয়ে বল গ্রহণে তার অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। লক্ষ্যভেদের কৃতিত্বও ছিল প্রশংসনীয়।

শীল্ড প্রতিযোগিতার সময় হাবুলবাবুর বয়স ২৫ বৎসর। কিন্তু ফুটবলের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। খেলা শুরু করেছিলেন কুমারটুলি ক্লাবে কিন্তু ১৯০৯ সালে থেকেই হয়েছিলেন মোহনবাগনের নিয়মিত খেলোয়াড়।

মাণিকতলা অঞ্চলের অধিবাসী এ' যুবকটি ছিল হাসিখুসি ও দিলখোলা। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৺কেবো-দার নিকট শুনেছি যে তিনি নাকি খুব আড্ডাবাজ লোক ছিলেন এবং গড়পাড়ের একটি সখের দলে যাত্রা অভিনয়ও করতেন। সবরকম খেলাতেই তার উৎসাহ ছিল প্রচুর।

কলিকাতার একটি মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারের সন্তান হাবুল সরকার বি, এ পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্সিং বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। হাবুলবাবুর কলিকাতা কর্পোরেশনের

সহকর্মিরা তাকে শীল্ড জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে একটি সোনার চেন উপহার দিয়েছিলেন। সেটি তিনি তার এক নাতনিকে বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিলেন।

অভিলাষ ঘোষ (সেণ্টার ফরোয়ার্ড): ১৮৯২ সালে ময়মনসিংহের একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে অভিলাষ ঘোষের জন্ম। তার পরিবারের সকলেই ছিলেন ক্রীড়া-রসিক এবং এক ভাই ৺কপি ঘোষ ছিলেন মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মানিত কর্মকর্তা।

অভিলাষ ঘোষের খেলার হাতেখড়ি হয়েছিল পণ্ডিতপাড়ার মাঠে কিন্তু সুনাম অর্জন করলেন তিনি মোহনবাগানে এসে। ১৯১১ সালে এ' ১৯ বছরের তরুণ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্র। সে' বছরই তিনি প্রথম মোহনবাগানে যোগদান করেন। দলে রাজেন সেনগুপ্ত ছিলেন তার সমবয়স্ক এবং এ' কারণেই রাজেন ও অভিলাষের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।



অভিলাষ ঘোষ

মরসুমের সূচনা থেকেই অভিলাষ সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার সাহস, ক্ষিপ্র গতি এবং লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখে সবাই বলতেন যে এ' ছেলেটির ফুটবল ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

শীল্ড অভিযানের সূচনাতে তিনি ছিলেন মাত্র অভিলাষ ঘোষ। সমাপ্তিতে "কালো দৈত্য" খেতাব পেলেন। অভিলাষ ঘোষের গায়ের রং ছিল নিকষ কালো, কিন্তু তাহার চেহারাতে দৈত্য-সুলভ কিছুই ছিল না। নাতিদীর্ঘ তরুণ অভিলাষের মুখে ছিল বাংলার নিজস্ব শ্যামলতার স্নিগ্ধ প্রলেপ। হাসিটি ছিল মধুর। তবু মিডল্‌সেক্‌স দলের গোল রক্ষক পিগট তার সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই "কালো দৈত্য" খেতাবেই খ্যাতনামা হয়ে উঠলেন অভিলাষ।

মিষ্টভাষী এবং অমায়িক অভিলাষ ঘোষ কর্মজীবনে ব্রুক বণ্ড কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়েছিলেন।

বাকি রইলেন ভাদুড়ী ভাই দু'জন—জ্যেষ্ঠ বিজয়দাস এবং কনিষ্ঠ শিবদাস।

পর্যায়ক্রমে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে বলেই লেফ্‌ট ইন বিজয়দাস এবং লেফ্‌ট আউট শিবদাসের উল্লেখ সর্বশেষে। মোহনবাগান দলে এ' দু' ভাই সম্মলিত ভাবে এনে দিয়েছিলেন মণি-কাঞ্চনের দীপ্তি। আর 'নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ' এ আপ্ত বাক্যেরও জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন এ' দু' ভাই।

মোহনবাগানের সুনাম অর্জনে ভাদুড়ী পরিবারের অবদান অসীম। বিজয়দাস ও শিবদাস কীর্তিমান হয়েছিলেন শীল্ড জয় করে। কিন্তু জয়লাভের পথে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের দুই অগ্রজ দ্বিজদাস ও রামদাস। মোহনবাগানের শৈশব ও কৈশোরে দ্বিজদাস এবং রামদাস ছিলেন অসামান্য কৃতী খেলোয়াড়।

বিজয়দাস ভাদুড়ী (লেফট ইন) ছিলেন বয়সের হিসাবে মোহনবাগানের ১৯১১ সালের দলের প্রবীণতম খেলোয়াড়। ফরিদপুরের অধিবাসী, কিন্তু খেলাতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তাজহাটে। সেখান থেকেই অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছিলেন মোহনবাগানে। ১৯০৮ সালে ট্রেড্‌স কাপের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলেরও খেলোয়াড় ছিলেন বিজয়দাস। তিনি ও সুধীর চ্যাটার্জি প্রায় একই সময়ে মোহনবাগান দলে যোগ দিয়েছিলেন।

৩০ বছর বয়স্ক বিজয়দাস



বিজয়দাস ভাদুড়ী

অপূর্ব ছিল তার পায়ের কায়দা এবং শরীরের মোচড়। এ' বেসাতি নিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের রক্ষণ বিভাগকে তছনছ করতেন। দর্শনীয় ছিল তার থ্রু পাশে বল এগিয়ে দেবার দক্ষতা। প্রতিপক্ষের রক্ষণ ব্যূহে সামান্য ফাঁক পেলেই তিনি সকলের তাক লাগাতেন। তাদের ফাঁকি দেবার জন্য সকল সময় তাঁর ফাঁকেরও প্রয়োজন হত না। ভাই শিবদাসের সহযোগিতায় "চিচিং ফাঁক" বলেই ইচ্ছামত ফাটল সৃষ্টি করতেন বিরুদ্ধ দলের প্রাচীরে।

সবাই এমনি ডাকত "বিজে" বলে, কিন্তু আদর করে বলত "পিছলে নম্বর এক।" বিজয়দাসের খেলা দেখে ক্যালকাটা ক্লাবের তদানীন্তন একজন খেলোয়াড় বলেছিলেন, "বিজয়দাসের যদি আর দুই ষ্টোন (২৮ পাউণ্ড) ওজন বেশি হত তাহলে স্কটল্যাণ্ডের ফুটবল মাঠেও তিনি চমক লাগাতে পারতেন।"

কর্মজীবনে বিজয়দাস দলের অন্যতম খেলোয়াড় সুকুলকে অংশীদার নিয়ে একটি দোকান খুলেছিলেন। পরে কুচবিহারের মহারাজার এ, ডি, সি রূপেও তিনি কিছুদিন কাজ করেছিলেন।

শিবদাস ভাদুড়ী (লেফ্‌ট আউট এবং অধিনায়ক): ফর্সা দীর্ঘকায় একহারা চেহারার শিবদাস দেখতে প্রায় বিজয়দাসের মতই ছিলেন। মনে হত যেন দুই যমজ ভাই, কিন্তু দু' জনের মধ্যে ছিল তিন বৎসরের ব্যবধান। শিবদাসের তখন ২৭ বছর বয়স।



শিবদাস ভাদুড়ী

শিবদাস ছিলেন ফুটবলের যাদুকর। তার পায়ের সোনার কাঠির স্পর্শে ফুটবল যেন কথা বলত। পায়ের সূক্ষ্ম কাজে ভানুমতীর ভেলকি দেখিয়ে শিববাস আসর মাত করে রাখতেন। মাঠে বল ধরলেই

চীৎকার উঠত, "শি···বু, শি···বু।" আর বল নিয়ে ছন্দোময় গতিতে তিনি অগ্রসর হলে সে' চীৎকার দীর্ঘায়িত হত, "শি···বু, শি···বু।" বিজয়দাসের ছোট ভাই বলে মাঠে সকলে বলত, "পিছলে নম্বর দুই।"

শিবদাসের খেলা আমাদের দেখা নয়। তার খেলার কথা কেবলই শোনা। তবে সম-সাময়িক সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে শিবদাসের ন্যায় ফুটবল প্রতিভা বিরল। মোহনবাগানের ন্যায় দলের নেতৃত্বে ছিল তার স্বাভাবিক অধিকার।

কর্মজীবনে শিবদাস ছিলেন সরকারী পশু চিকিৎসা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টর।

মোহনবাগানের ১৯১১ সালের খেলোয়াড়দের এই সামান্য পরিচিতি থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সন্তানেরাই ছিলেন সেই অসামান্য কীর্তির স্থাপয়িতা। সেই সর্বজয়ী অমর একাদশের প্রত্যেকেই ছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি সামজের প্রতিনিধি। বহু ব্যর্থতার পশ্চাদ্‌পটে তারাই সফল করেছিলেন স্বার্থকতার স্বপ্ন।

তাদেরই কৃতিত্বে এবং পরবর্তী বহু খেলোয়াড়ের সার্থক অবদানেই মোহনবাগান আজ হয়ে উঠেছে এমন ঐতিহ্যময় এবং গৌরবমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান।